লেখা থাক

সোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

টাকা

নরওয়ের পাহাড়ে বরফের দৃশ্য

হ্যামলেটের রাজপ্রাসাদের তোরণ

চিঠি পেয়ে চমকে গেলুম। মিরেক লিখছে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যাবার জন্যে সে প্রস্তুত, অমুক তারিখে কোপেনহাগেনে আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি।

চিঠিটা পেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলুম। যাত্রার সঙ্গী হিসেবে মিরেকের মতো সঙ্গী আর হতে পারে না—গেলবারের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমি জেনেছি। তখনই আমি ম্যাপ খুলে বসলুম। ম্যাপ জিনিসটা অন্য সময়ে দেশবিদেশের নীরস নক্সা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যাত্রার স্বপ্নে যারা বিভোর তাদের কাছে ঐ নক্সা আর রঙ চঙ আর ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা-জোকা সব জীবন্ত হয়ে ওঠে। যাত্রার আগেই ঐসব দাগ বেদাগের উপর দিয়ে এক দফা দেশ বেড়ানো হয়ে যায়। একটা খুব প্রকাণ্ড ম্যাপ পেয়েছিলুম। পাহাড়, বন, নদী, রেল, রাস্তা, গ্রাম, শহর, প্রায় সবই দেখানো আছে। যত দেখতে লাগলুম ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলুম। কোন্ জায়গা বাদ দিয়ে কোন্ জায়গায় যাবো? মনে হল সব জায়গাতেই যেতে হবে। মোটামুটি একটা প্ল্যান ঠিক করব বলে বসেছিলুম, কিন্তু সমস্তই যেন গোলমাল হয়ে গেল, কিছুই হয়ে উঠল না। উঠে পড়লুম।

সেদিন রাত্রে ক্লাবে খাবার টেবিলে হঠাৎ এক নরোয়ীজান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললুম—তোমাদের দেশে যাচ্ছি যে!

—কবে?

—পর্শু বেরচ্ছি এখান থেকে।

—পর্শু? অস্‌লো যাবে তো? তাহলে এক্ষুনি আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি আমাদের বাড়িতে। তোমাকে দেখলে আমার মা, ভাই বোন খুব খুশী হবেন। যাবে তো?

—নিশ্চয়ই যাবো, যদি ঠিকানা দাও।

তুয়ার কাছ থেকে তার অস্‌লোর ঠিকানা আর মায়ের নাম নিলুম। নরোয়ীজানরা প্রায় সকলেই এইরকম বিদেশী অতিথির ভক্ত। বিদেশী কেউ তাদের দেশ দেখতে যাচ্ছে সাগর-পাড়ি দিয়ে, এ শুনলে আর তারা স্থির থাকতে পারে না; সব রকম সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত।

তুয়া বললে—তারপর? কোন্‌দিকে ঘুরবে তুমি? কতদিন থাকবে নরওয়েতে? কিছু প্ল্যান করেছ?

আমি বল্লুম—দেশটা এতই অজানা আর এত সুন্দর মনে হচ্ছে যে, প্ল্যান কিছু করে উঠতে পারছি না। পাহাড় অঞ্চলে পিঠ-ঝুলি কাঁধে কিছুদিন ঘোরবার ইচ্ছে আছে। কোথা যাই বলতে পারো?

—য়োটুন্‌হাইম্‌। —এর চেয়ে সেরা পাহাড় নরওয়ে খুঁজলেও পাবে না।

আমি তাড়াতাড়ি ঐ নামটা আমার নোটবইএ টুকে নিলুম।

তুয়া তাদের দেশের পাহাড় আর হ্রদ আর ফিয়োর্ড আর ফিয়োর্ডের ধারে ছবির মতো জেলেদের গ্রামের অনেক গল্প করলে। যাবার আগে এইরকম গল্প শুনতে ভারি ভালো লাগে—তার কিছু মনে থাকে, কিছু মনে থাকে না, কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হয়, যে দেশে যাচ্ছি, তার চেয়ে সেরা দেশ আর নেই।

হিলারি, আমার ইংরেজ বন্ধু, আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাচ্ছি শুনে বললে—সুইডেনে যখন যাচ্ছো, তাহলে একটা জিনিস কিন্তু করতে ভুলো না।

আমি বললুম—সে জিনিসটা কি?

হিলারি বললে—সুইডেনের পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি একটা খাল আছে, তার নাম গ্যোটা খাল। স্টীমারে করে এই খালটি দেখো—দেখবে সমস্ত সুইডেনই তোমার দেখা হয়ে গেল।

আমি বললুম—বেশ তবে কথা রইল গ্যোটা খাল থেকে একখানা ছবির পোস্টকার্ড তোমায় পাঠাব।

সস্তায় দেশ বেড়ানোর হদিস গেল-বছরেই অনেকটা শিখে নিয়েছি। যে সমস্ত অযোগ্য খরচ অল্প আয়াসেই বাঁচানো যায়, অল্প মাথা ঘামালেই লট-বহরের যে সব ঝঞ্ঝাট কমিয়ে সহজ সরল করে নেওয়া যায়, খাঁটি চরণিকের পক্ষে তা অবশ্য-কর্তব্য। সেই রীতি অনুসারে আমি অতি যত্নে আমার পিঠ-ঝুলি গুছিয়ে নিলুম! চরণিকের পোশাক পরে হালকা হলুম। সঙ্গে একটা ছোট সুটকেস রইল, যার মধ্যে দু-একটা দরকারী পোশাক-পরিচ্ছদ—যদি কোনদিন কোন শহরে গিয়ে শহুরে সাজবার হঠাৎ প্রয়োজন ঘটে।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র আমরা যারা থাকি, তাদের পুঁজিপাটা এমনিতেই খুব কম—গোটা দুই সুটকেসের মধ্যে সব কিছু ধরে যায়, মায় বইপত্র নোটবুক পর্যন্ত। তাই এইসব লম্বা ছুটিতে বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দিয়ে আমরা লণ্ডনের পাট উঠিয়ে দিয়েই চলে যাই। আমার যথাসর্বস্ব সম্পত্তি দুটি সুটকেসের মধ্যে ভরে ক্লাবের জিম্মায় রেখে এলুম সাড়ে তিন মাসের জন্যে।

ক্লাব থেকে ফিরে সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলুম। কাল সকালে ট্রেন। যাত্রার উত্তেজনায় আজ কত রাত্রে ঘুম আসবে কে জানে? হয়তো আসবেই না। ম্যাণ্টল্‌পিসের উপর যেখানে আমার বইগুলো সাজানো থাকতো, সে জায়গাটা খালি হয়ে গেছে। চা গরম করবার কেটলিটা নেই, পেয়ালা-পিরিচও টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। আর বিশেষ কিছু আসবাব ছিল না বটে, কিন্তু ঐ কটা জিনিস সরিয়ে ফেলাতেই ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। ঘরটার সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার সম্পর্ক চুকে গেছে বলে বোধ হয়। দরজার পাশে আমার পিঠ-ঝুলি আর ছোট সুটকেসটা দেখেই মনে হয় তারাও যাবার জন্যে তৈরী।

রাত্রে সত্যিই ভালো ঘুম হল না। ভোরবেলা চোখ খুলে প্রথমেই চোখে পড়ল পিঠ-ঝুলিটা। মনে হল, বাঃ এই তো চরণিক জীবন আরম্ভ হয়ে গেছে। লাফিয়ে উঠে পড়লুম বিছানা থেকে। পিঠ-ঝুলিটা পিঠে নিয়ে হাতে ছোট সুটকেসটা ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরলুম। তারপর লণ্ডনের মাটির নীচের ট্রেনে চড়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ছোট্ট ম্যাপটা পকেট থেকে বার করলুম, হিলারি যে গ্যোটা খালের কথা বলেছিল, সেটা কী দেখবার জন্যে। দেখলুম সুইডেনের পশ্চিম উপকূল থেকে আরম্ভ করে একটার পর একটা হ্রদ পার হয়ে সেই খাল পূর্ব উপকূলে শেষ হয়েছে। মনে মনে যখন ছবি আঁকছি, ঝিরেঝিরে হ্রদের হাওয়ায় স্টীমারের বেঞ্চিতে দুপুরের রোদে বসে দুপারের দৃশ্য দেখছি—গ্রামের ফলন্ত গাছে ঢাকা রাস্তার, মাঠের, শস্যক্ষেতের, ছোট ছোট কুটিরের, ঠিক তখনই মাটির নীচে আমার গন্তব্য স্টেশনে এসে পৌঁছলুম।

সেখান থেকে উপরে উঠে এবার মাটির উপরের ট্রেন ধরলুম ইংলণ্ডের পুব উপকূলের উদ্দেশে। হারউইচ্‌এ গিয়ে স্টীমারে যখন উঠলুম, তখন সেই আগের দিনের মন-ভোলানো রোদ অদৃশ্য হয়েছে। ইংলণ্ডের দশাই এই। একদিন রোদ হয় তো দশদিন অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির মধ্যে উত্তর সাগরের মধ্যে দিয়ে ডেনমার্কের দিকে আমাদের জাহাজ পাড়ি দিল।

জাহাজে নানারকম লোক ছিল, তার মধ্যে দেখছিলুম একটা দল। একদল ছেলেমেয়ে, সঙ্গে তাদের খানকতক সাইকেল—মহা ফূর্তি করতে করতে যাচ্ছে। এদের লক্ষ্য করছি দেখে একজন আমার সঙ্গে এসে আলাপ করল। এরা ইংলণ্ডের কোন এক শহরের স্কুলের ছাত্রছাত্রী। নিজেদের শহর ছেড়ে বেশী দূরে কখনো যায় নি। এবার চলেছে ডেনমার্কে—সাইকেলে করে ঘুরবে। সঙ্গে নিয়েছে একজন গাইড—একটি ডেনিশ ছেলে, তাদেরই মতো স্কুলের পড়ুয়া।

আমি বললুম—কোথা থেকে পেলে এই গাইডকে ?

সে বললে—তাও জানো না বুঝি ? ইংলণ্ডে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার নাম ন্যাশনাল য়ুনিয়ান অফ স্টুডেণ্টস—

আমি বললুম—হ্যাঁ, জানি বটে।

—তাদের লিখলুম, আমরা ডেনমার্কে যেতে চাই, সাইকেল করে ঘুরতে চাই—কিন্তু ওদের ভাষা আমরা কেউ জানিনে। এ বিষয়ে ওরা কিছু সাহায্য করতে পারে কি না ? সঙ্গে সঙ্গে এই ইংরেজী-জানা ডেনিশ গাইড এসে হাজির। ছেলেটি ভারি চমৎকার, চলো না, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি তখন ডেনিশ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করলুম। সে যখন শুনলো আমিও ছুটিতে যাচ্ছি বেড়াতে, বলে বসল—এসো না আমাদের দলে—ডেনমার্ক যে কত সুন্দর দেশ দেখিয়ে দেব।

আমি বললুম—ডেনমার্ক তো নিশ্চয়ই সুন্দর দেশ। কিন্তু তোমরা যে সাইকেলে করে ঘুরবে।

সে বলল—তোমাকেও সাইকেল দেব একখানা। ডেনমার্কে কখনও সাইকেলের অভাব হয় না। আমাদের দেশে মানুষ যত, তার চেয়ে বেশী সাইকেল।

আমি বললুম—সে কথা বলছি না। সাইকেলে অত চড়া আমার অভ্যাস নেই।

সে বলল—কেন, তোমাদের দেশে কি লোকে সাইকেল চড়ে না?

আমি বললুম—আমাদের দেশেও লোকে সাইকেল চড়ে। কিন্তু আমি হেঁটে বেড়াতেই ভালবাসি।

ভাগ্যিস্ ওদের দলে যোগ দিইনি—দিলে ডেনমার্কেই মারা পড়তুম। দুর্দান্ত সাইক্লিস্ট এরা সব। ঘরের চৌকাঠ থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে, জাহাজঘাটা পর্যন্ত সেই সাইকেলের পিঠে, এর মধ্যে বিশ্রাম নেই, নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। ট্রেন, বাস, লরি, কিছুই এরা মানে না, কিছুই এরা বিশ্বাস করে না, এদের কাছে পৃথিবীতে আছে একমাত্র সাইকেল, তাতে করেই এরা পৃথিবী মাং করে। এই রকম সাংঘাতিক প্রকৃতির বহু সাইক্লিস্ট ইয়োরোপের রাস্তায় রাস্তায় আমি দেখেছি। এদের তুলনা নেই।

পরের দিন সকালে যখন ডেনমার্কে পৌছলুম, তখন মেঘ কেটে রোদ উঠে পড়েছে। ট্রেন তৈরীই হয়ে ছিল আমাদের জন্যে। এই ট্রেনটা ভারি মজার। ডেনমার্কের ম্যাপ খুললে দেখা যাবে, সে দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে পুব উপকূলে কোপেনহাগেনে যেতে হলে সমুদ্র পার না হয়ে উপায় নেই। কারণ বড় চারখানা দ্বীপ এবং উপদ্বীপ নিয়ে হচ্ছে সমস্ত দেশ—অথচ কোপেনহাগেনে যাবার যে এক্সপ্রেস ট্রেনখানা সেটা ধরলে গাড়ি বদল না করেই কোপেনহাগেনে পৌছান যায়। এটা কি করে সম্ভব? ব্যাপারটা বুঝলুম যখন একটা দ্বীপ পার হয়ে আমাদের ট্রেনখানা সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল। পেটের মধ্যে ফুটো করা প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। ট্রেনটা সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই জাহাজের পেটে। জাহাজ দিল ছেড়ে। ট্রেনের কামরা থেকে আমরা বেরিয়ে জাহাজের ডেকে গেলুম দৃশ্য দেখতে। এক ফালি

সমুদ্র পার হতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। ওপারে এসে পৌঁছতেই আমরা ট্রেনের কামরায় ফিরে গেলুম। হুস্ হুস্ শব্দ করতে করতে জাহাজের পেটের ভিতর থেকে আমাদের ইঞ্জিনখানা বেরিয়ে উঠল গিয়ে ডাঙায় পাতা লাইনের উপর। এইভাবে বোধ হয় বার দুই আমরা সমুদ্র পার হয়েছি। জাহাজের পেটের মধ্যে ট্রেন নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া এই হচ্ছে ডেনমার্কের বিশেষত্ব।

॥ ২ ॥

বিকেলের দিকে কোপেনহাগেনে এসে পৌঁছলুম। মিরেক কয়েক ঘণ্টা আগে সেখানে এসে পৌঁচেছে। স্টেশনের পোস্ট আপিসের ঠিকানায় মিরেকের নামে চিঠি দিয়েছিলুম, কোন ট্রেনে আমি পৌঁছচ্ছি সেই খবর দিয়ে। মিরেক সেই চিঠি পেয়ে স্টেশানেই থেকে গিয়েছিল। মিরেকও আমার নামে চিঠি দিয়েছিল তার আসার ট্রেনের সময় জানিয়ে দিয়ে। আমি যদি আগে পৌঁছতুম তাহলে আমিই মিরেকের জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করতুম। দূরদেশে অজানা শহরে পরস্পরকে খুঁজে বার করবার এই হচ্ছে সহজ ব্যবস্থা। ট্রেনের চলন্ত কামরা থেকে প্ল্যাটফরমে পিঠঝুলি পিঠে মিরেকের মূর্তি দেখে আমার পা-জোড়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মনে হল, এখনই শুরু হয়ে যাক আমাদের চলা। আমার পিঠঝুলিটা কাঁধে তুলে ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। অনেক দিন বাদে মিরেককে দেখে খুব আনন্দ হল। বললুম যাত্রার প্ল্যান কিছু ঠিক করেছ মিরেক?

মিরেক বললে—না, কিছু ঠিক করিনি। ভেবেছিলুম, দুজনে একসঙ্গে বসে পরামর্শ করা যাবে।

আমি বললুম—লণ্ডন থেকে বেরোবার ঠিক আগে মধ্য নরওয়ের পাহাড়শ্রেণী য়োটুনহাইম্‌এর কথা শুনে এসেছি। আর শুনেছি সুইডেনের গ্যোটা খালের কথা। এই দুই জায়গায়ই আমার যাবার ইচ্ছে। তুমি কি বল?

মিরেক বললে—বেশ, আপাতত তাই ঠিক রইল।

আমরা উভয়েই আন্তর্জাতিক য়ুথ হস্টেল সমিতির সভ্য, কাজেই কোপেন-হাগেনের য়ুথ হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলুম। ভ্রাম্যমান ছাত্রদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ইয়োরোপের কোথাও নেই। যেমন সস্তা তেমনি আবার প্রাণবন্ত সুস্থ সতেজ যাত্রীতে ভরা এই সব হস্টেল। নানাদিক থেকে নানারকম চরণিক আর সাইক্লিস্টের মিলন হয় এখানে। পরের দিনের ভ্রমণের খুঁটি নাটি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রত্যেকে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। খাবার ঘরের টেবিলে টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে ছোট ছোট দল যাত্রাপথের আলোচনায় মগ্ন থাকে। ভ্রমণের গল্প প্রায় সকলেই করে; ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক আলোচনাও প্রচুর হয়। না হলে গান বা গল্প। মোটের উপর মুখ বুজে কেউ বসে থাকে না। সাধারণ হোটেলের সঙ্গে য়ুথ হস্টেলের এই তফাৎ। তবে য়ুথ হস্টেলে প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যেমন মুসাফিরের সঙ্গে মুসাফিরের আলাপ, বন্ধুত্ব, মনের মিল অতি দ্রুত জমে ওঠে; মনে হয় যেন একই পরিবারের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়েরা অভূতপূর্ব উপায়ে এক আস্তানায় এসে মিলেছে, ঠিক তেমনি দ্রুত সকাল বেলায়ই জমা হাট কিসের স্পর্শে যেন ভেঙে যায়। ভোর থেকেই হুড়োহুড়ি লেগে যায়। সকলেই পালাবার জন্যে যেন ব্যস্ত। অত সাধের আস্তানা, অমন জমাট আড্ডা, অত মন খুলে দেওয়া, অত প্রাণভরা সখ্য, এ সবই যেন লোকে ভুলতে আরম্ভ করে। সকালের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সবই যেন আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যায়। তখন দিকে বিদিকে বেড়িয়ে পড়বার নেশায় সবাই পাগল—শুধু নিজের দলের সঙ্গী ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবার কারো সময় নেই। খাবার ঘরে বা ঝরনার ধারে গা ধোবার সময় দেখা হলো তো বিদায় সম্ভাষণ হলো, তা নইলে গত রাত্রের বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেই যে যার যাত্রা পথে বেরিয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে য়ুথ হস্টেল খালি হয়ে যায়। ম্যানেজার মশাই শূন্য বাড়ির মধ্যে একা পড়ে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিকেলের দিকে একটি দু'টি করে যাত্রী আবার এসে জুটতে থাকে।

আমরা সেদিন সন্ধ্যায় য়ুথ হস্টেলের কামরায় আলোচনা প্রসঙ্গে শুনলুম

কোপেনহাগেন থেকে কয়েক মাইল উত্তরে ডেনমার্কের প্রাচীন যুগের রাজপুত্র হ্যামলেটের ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ আছে। মিরেক বা আমি শেক্সপীয়ার পড়বার পর কেউই মনে করে রাখিনি হ্যামলেটের স্থান ছিল ডেনমার্ক। তা ছাড়া হ্যামলেট যে শুধু গল্পের রাজপুত্র নন ঐ নামে যে সত্যিকারের একজন যুবরাজ ছিলেন এ নিয়েও আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। সেই হ্যামলেটের জলজ্যান্ত রাজপ্রাসাদের কথা শোনামাত্র মিরেক আর আমি আমাদের পরদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললুম। সকালে উঠেই ট্রেনে করে হ্যামলেটের প্রাসাদ দেখতে যাবো। তারপর সেখান থেকে হাঁটন দেব ডেনমার্কের উত্তর উপকূল পর্যন্ত। হাঁটতে প্রায় সারা দুপুর লাগবে—সেখানে সমুদ্রতীরে হর্নবেক নামক জায়গায় একটি য়ুথ হস্টেল আছে।

পরদিন ভোরে উঠেই পিঠ-ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। হ্যামলেটের প্রাসাদ দেখতে দেখতে মনে মনে অনেক চেষ্টা করলুম সেই শেক্সপীয়ারের যুগে ফিরে যাবার ; হ্যামলেটের নিহত পিতার প্রেতাত্মার উপস্থিতি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সুর খুঁজে পেলুম না। প্রাসাদের দোষ নেই, আসলে আমাদের রক্তে তখন চরণিকের ছন্দ এসে প্রবেশ করেছে। ডেনমার্কের উদার প্রান্তরে তখন রোদ আর উষ্ণ বাতাসের খেলা, গাছের ঝিরঝিরে পাতা তখন ঘন সবুজ হয়ে এসেছে। তখন কি আর পাথরের ধূসর প্রাসাদ আর স্থাপত্য মনকে টানতে পারে, যতই কেন বড় কবি আর নাট্যকার হোন না শেক্সপীয়ার।

প্রাসাদ থেকে বার হয়ে একটা সরাইখানায় খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম সোজা উত্তরমুখো। পীচঢালা সমান রাস্তা, মাঝে মাঝে মোটর গাড়ি চলেছে—চরণিকদের হাঁটবার উপযুক্ত মোটেই নয়। তাহলেও আমরা চলেছি। ম্যাপে দেখছি ডেনমার্কের সবটাই সমভূমি, পাহাড় বলে কোথাও কিচ্ছু নেই। এখানে সাইকেল নিয়ে ঘোরার খুব সুবিধে কিন্তু হেঁটে মজা নেই। প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটেছি। বহুদিন পরে পিঠঝুলি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি, এতেই মশগুল, কিন্তু বাঁধানো রাস্তা না হয়ে মেঠো রাস্তা হলেই আরো ভাল হত। আশপাশের

দৃশ্য, মাঠের সুগোল ঢালু জমির পিছনে ডেনিশ কুটিরের শ্রেণী, ঝক্‌ঝকে মাঠ আর ঝলমলে তরু গুচ্ছ, সব নিয়ে ভারি সুন্দর একটা ঘরোয়ানা ভাবের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো সাজানো পার্কের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি। এ হাঁটায় মধুরতা পাচ্ছি কিন্তু মাদকতা পাচ্ছি না, স্নিগ্ধতা অনুভব করছি কিন্তু ফূর্তি নেই।

মিরেককে সবেমাত্র বলেছি—মিরেক, ডেনমার্ক ছেড়ে সুইডেনের দিকে কবে আমরা পা বাড়াবো? এমন সময় আমাদের বাঁ পাশে ভোঁ করে একটা ভেঁপুর শব্দ শুনলুম। দেখি একটা ছোট্ট সবুজ মোটর গাড়ি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা চমকে গিয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখি, একজন মহিলা, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, মোটর থামিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রস্তুত। আমরা এগিয়ে যেতেই ইংরেজীতে বল্লেন—আপনারা ছাত্র?

আমরা বললুম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

—বেশ তো তবে আমার গাড়িতে উঠুন না, আপনাদের দিকেই তো আমি যাচ্ছি। কতদূর যাবেন?

—আমরা তো হাঁটব ভেবেছিলুম হর্নবেক পর্যন্ত।

মহিলা বললেন—ওঃ সে অনেক দূর। অতদূর আমি যাবো না যদিও, তাহলেও কিছুটা আপনাদের এগিয়ে দিতে পারি।

গাড়ির দরজা খোলা পেয়ে আমরা ততক্ষণে ভিতরে গিয়ে পিঠঝুলিটা কোলে নিয়ে গুছিয়ে বসেছি। এ অভিজ্ঞতা আমাদের আগে কখনো হয়নি। ইংলণ্ডে থাকতে হিচ্‌-হাইকিংএর গল্প কিছু কিছু শুনেছিলুম বটে কিন্তু কি করে যে সেটা করতে হয় তার কায়দা-কানুন কিছুই আমাদের জানা ছিল না। কোনোদিন জানবার চেষ্টাও করিনি।

ভদ্রমহিলা বলে চললেন—এ দেশে বিদেশী ছাত্রদের গাড়ি করে পৌছে দিতে আমরা খুব ভালবাসি।

আমার ভারি আশ্চর্য লাগল। বললুম—কেন আপনাদের ভাল লাগে?

মহিলা বললেন—তা বলতে পারি না। কিন্তু ডেনমার্কে তরুণ জীবনকে,

খোলা হাওয়াকে, সজীব প্রকৃতিকে সবাই ভালবাসে। ছাত্রেরা যখন পিঠঝুলি ঘাড়ে নিয়ে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নেমে এসে প্রকৃতির আনন্দের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়, তখন সে স্রোত আমাদেরও মনে এসে লাগে বৈ কি! তাই বোধহয় আমরা গাড়ি থামিয়ে তাদের তুলে নিই। অবশ্য সকলেই যে আপনাদের তুলে নেবে তা নয়। অনেকেই হয় তো ব্যস্ত হয়ে কাজের তাড়ায় ছুটেছে, তাদের কোনোদিকে দেখবার অবসর নেই। কিন্তু ডেনমার্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনি যদি হাত দেখান, দেখবেন বেশীর ভাগ চালকই থেমে গিয়ে তাদের গাড়িতে আপনাদের জায়গা দেবে। বিশেষ করে, দেখলেই যখন বোঝা যায় আপনারা ছাত্র।

এইভাবে গল্প করতে করতে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে মহিলা একটি মোড়ের মাথায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—ডেনমার্ক ভাল করে দেখুন। কষ্ট করে হাঁটবেন কেন? এক এক লাফে দশ মাইল বিশ মাইল করে যান, কোনো কষ্ট নেই। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এমনি লাফা-যাত্রা করেই যেতে পারবেন। বিদেশী ছাত্রেরা অনেকেই এইভাবে এ দেশ দেখে।

আমাদের নিজেদের উপর কেমন একটা শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাই তো, আমরা তাহলে ছাত্র? আমাদেরও খাতির আছে—লোকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের রাস্তা থেকে তুলে নেয়! নাঃ, ডেনমার্ক একটা দেশ বটে! যেখানে ছাত্রদের এত খাতির তার মতো দেশ আর হয় না।

মিরেককে বললুম—মিরেক, দাঁড়াও আরেকটা ডেনিশ গাড়ি আমি তাহলে দাঁড় করাই।

মিরেক বললে—দাঁড় করাতে হবে কেন? আমাদের দেখে ছাত্র বলে চিনতে পারলে আপনিই তো গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে।

মিরেকের রসিকতায় আমি হেসে বললুম—বেশ, যদি প্রথমটা না থামে, দ্বিতীয়টার বেলা আমি কিন্তু হাত তুলবো।

এই বলে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করে দিলুম। অল্পক্ষণ পরেই একটা মোটর গাড়ি এসে পড়ল, কিন্তু আমাদের ছাত্র বলে চিনতে পারলে না, অর্থাৎ থামলো না। দ্বিতীয় গাড়িটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল। আমি মরিয়া হয়ে হাত তুললুম। গাড়িটা যখন হুস্ করে বেরিয়ে চলে গেল, দেখলুম বাইরের ভিতরের সমস্ত জায়গাগুলিই ভর্তি। চালকের মুখে বেশ দেখতে পেলুম একটু হাসি লেগে রয়েছে। এ হাসির যে কি অর্থ আমরা বুঝতে পারলুম না। হয়তো কোনো অর্থই নেই। তবু মনে হতে লাগল, বোধহয় ঠাট্টা করে গেল। এইবার যখন একটা গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখলুম তখন হঠাৎ যেন নিজেকে খাটো মনে হতে লাগল। হাত তুলবো কি তুলবো না মনস্থির করে উঠতে পারলুম না। গাড়িটা কাছে এসে পড়ল। ভাবছি, হয়তো এ গাড়িটাও ভর্তি, হাত তুলে লাভ কি? এর চালকও হয়তো একটু হেসে চলে যাবে। উঃ ঐ হাসিটাই যত সর্বনাশের মূল। নিজেদের উপর বেশ একটা শ্রদ্ধা একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছিল, ঐ এক হাসির ধাক্কায় সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এ গাড়িটায় দেখলুম পিছনের জায়গাটা খালিই আছে—কিন্তু হাত আর আমার উঠল না—কেমন মন-মরা হয়ে চলতে লাগলুম।

মিরেক বললে—কি হল তোমার?

আমি বললুম—আমরা হাঁট্‌তেই তো বেরিয়েছি। গাড়ি থামিয়ে পরস্মৈ ভ্রমণ করে কি হবে? এসো হাঁটা যাক—সন্ধ্যের আগেই হনবেক পৌঁছে যাবো।

দুজনে মিলে মুখ গুঁজে হাঁটতে লাগলুম। গাড়ির পর গাড়ি চলে যেতে লাগল—কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু একটুক্ষণ পরেই মনে হল—এ কি? এ যে হার স্বীকার করা হয়ে গেল। ঐ একটা গাড়ির একজন চালক গাড়ি না থামিয়ে হেসে চলে গেল, এতেই আমরা মুষড়ে পড়লুম? এমনটা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না—গাড়ি একটা থামাতেই হবে। মিরেককে বললুম—মিরেক, চরণিক তো আমরা হয়েইছি। কিন্তু লাফা-যাত্রী হতে গিয়ে হটে যাবো এ সহ্য হয় না। এসো দুজনে মিলে এবার চেষ্টা করা যাক, গাড়ি থামাতে পারি কিনা দেখি।

মিরেক রাজী হল। একটা আগন্তুক গাড়ি দেখে দুজনে মিলে একসঙ্গে হাত তুললুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

মিরেক বললে—শুধু হাত তুললে হবে না, ঐ সঙ্গে একটু হাসিমুখ দেখাতে হবে, তবে না গাড়ি থামবে!

এবারকার গাড়িটা এগিয়ে আসতেই দুজনে যথাসম্ভব হাসিমুখে হাত তুলে দাঁড়ালুম। কিন্তু এবারেও নিস্ফল।

মনে মনে দমে গেলেও মুখে সে ভাব কিছুতেই প্রকাশ করতে দেওয়া হবে না, তাই গাড়িওয়ালাদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা শুরু করলুম। ঠাট্টার বস্তু হচ্ছে, এমন দুজন উপযুক্ত ছাত্রকে আজকের দিনটায় ডেনিশরা কেন চিনতে পারছে না?

এইভাবে চলেছিলুম। পাঁচ পাঁচটা মোটার আমাদের উদ্যত বাহুকে উপেক্ষা করে চলে গেল, তাদের গতি পর্যন্ত একটুও কমালো না।

আমি মিরেককে সবে মাত্র বলেছি—দেখ মিরেক, সব মানুষ পৃথিবীটাকে নিজের মত করে দেখে। তা নইলে ঐ যে মহিলা আমাদের বলে গেলেন, ডেনমার্কে লাফা যাত্রা কত সহজ, কই তাঁর মতো একজনও মোটর চালক এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। বলতে বলতেই দেখি মিরেকের হাত তোলা দেখে একখানা গাড়ি রাস্তার ধারে থেমেছে। হঠাৎ ভারি আনন্দ হল। দৌড়ে গিয়ে দেখি, হলদে রংএর গেঞ্জি গায়ে একটি ছেলে স্টীয়ারিংএ বসে। বোধহল গাড়ির ড্রাইভার, নিজের গাড়ি নয়। যাই হোক, তাতে আমাদের কি এসে যায়? আমরা গিয়ে বললুম—আপনি হর্নবেকের দিকে যাচ্ছেন?

ইংরেজী ভাষায় বললুম, জার্মাণ ভাষায় বলুলম। কিছু যে বুঝতে পারল তা মনে হল না। ছেলেটি ইঙ্গিতে আমাদের গাড়িতে উঠতে বললে। মোটেই নিশ্চিত হওয়া গেল না যে, আমাদের গন্তব্য পথে গাড়িটা যাবে। তাহলেও এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া শক্ত। উঠলুম দুজনে এবং লক্ষ্য রাখলুম গাড়িটা সোজা উত্তর দিকে যায় কি না। যদি দেখি অন্য কোনো দিকে মোড় ঘুরছে,

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি করে গাড়িকে থামাতে হবে। কিন্তু বৃথা আমাদের ভয়। গাড়ি ঠিক সোজা চললো এবং হর্নবেক শহরের প্রান্তে এসে তবে থামলো। ড্রাইভার রাস্তার ডান পাশে গাড়িটা থামিয়ে একটা হলদে রং-এর খুঁটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম একটা খুঁটিতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—হর্নবেক, এক কিলোমিটার।

আমরা বুঝলুম ড্রাইভার আমাদের আর কোনো কথা না বুঝুক হর্নবেক কথাটা ঠিক বুঝেছে। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

একটু হেঁটেই আমাদের আস্তানা মিললো। ভারি সুন্দর তকতকে একটি কুটির হর্নবেকের এই য়ুথ হস্টেল। আমরা পিঠের মোট নামিয়ে আমাদের টিকিট দেখিয়ে, খাতায় নাম লিখিয়ে নিজেদের বিছানা পছন্দ করে নিলুম। এক এক ঘরে প্রায় জন কুড়ির জায়গা—প্রত্যেকটা খাটই দোতালা। নিজেদের বিছানা নিজেরাই করে নিতে হয়। পিঠঝুলিতে প্রত্যেক যাত্রীরই স্লিপিং ব্যাগ থাকে—কাজেই বিছানা করতে দুমিনিটের বেশী সময় লাগে না। হাতমুখ ধুয়ে পিঠঝুলির মধ্যে থেকে কিছু বেকন, ডিম, রুটি, মাখন চা আর ফল বার করে আমরা রান্না ঘরের দিকে এগলুম। রান্নার বাসনপত্র য়ুথ হস্টেলেই পাওয়া যায়। কাজ হয়ে গেলে বাসন ধুয়ে যেখানকার জিনিস সেখানে গুছিয়ে রাখতে হয়, এই নিয়ম। আমাদের সামান্য আহার-পর্ব খুব শীঘ্রই সমাধা হয়ে গেল। তখন আমরা বেরলুম সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রের ধারে আমরা যখন পৌঁছলুম, রাত তখন ন'টা। কিন্তু উত্তর ডেনমার্কের গ্রীষ্মের আকাশে সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। দিব্যি আলোতে বহু লোক সমুদ্রতীরে পায়চারি করছে। আমার মতো ভারতীয়ের পক্ষে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের তীরে বসে রাত নটার পর সূর্যাস্ত দেখলুম। মিরেক বললে—আরো ঘণ্টা দুই এখনও আলো থাকবে—আর এখানে গ্রীষ্মের রাতই বা কতটুকু।

আমি বললুম—আমাদের দেশে যারা ভূগোল পড়ে নি তাদের পক্ষে এই জিনিসটা বিশ্বাস করা শক্ত। তুমি বরঞ্চ সমুদ্রকে পিছনে রেখে আমার একটা

ছবি তোলো। তার নীচে আমি লিখে দেব উত্তর ডেনমার্কে রাত নটায় তোলা, অমুক তারিখ, অমুক সাল। তা হলে আর অবিশ্বাস করার কিছু থাকবে না।

মিরেক আমাদের দেশের ভূগোল-না-পড়া লোকদের সম্বন্ধে কি ভাবলে জানি না, কিন্তু ক্যামেরা বার করে তখনই আমার একটা ছবি তুলে নিলে।

এর কিছু পরেই আমরা কুটিরে ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখলুম বহু চরণিকের সমাগম হয়েছে—প্রায় সকলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, দু-একজন ছাড়া। আমাদেরও সেদিন ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হল না।

পরদিন সকালে উঠেই আমরা সমুদ্রে স্নান করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। মিরেক একটা দোকানে ঢুকে সমুদ্রে খেলবার জন্যে একটা রবারের বল কিনে নিয়ে এল। সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলুম, দিনটাও যেমন সুন্দর লোকের ভিড়ও তেমনি। জলে অবশ্য খুব বেশী লোক নেই কিন্তু বালির উপর মনে হয় যেন আর মানুষ ধরছে না। আমরা স্নানের পর্ব সেরে নিলুম। বলটাকে যতবারই যতদূরেই হোক জলের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলুম, সমুদ্রের ঢেউ ততবারই তাকে তীরে পৌছে দিতে থাকল। আরো অনেকেই বল ছুঁড়ে খেলা করছিল, তা ছাড়া দুজন লোক জলে 'সার্ফ রাইডিং' করছিল। একটা দুরন্ত মোটার বোটের পিছনে লম্বা দড়ি বাঁধা—দড়ির সঙ্গে একটা ছোট কাঠের তক্তা। তক্তার গায়ে লাঠির মতো খাড়া লাগানো আর একটুকরো কাঠ। এই তক্তাটুকুর উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে লাঠিটা দুহাতে চেপে ঢেউএর উপর দিয়ে মোটার বোটের পিছনে পিছনে ছোটা। ঢেউএর উপর দিয়ে এইভাবে তীরবেগে ছুটে যাওয়াও নিশ্চয় খুব মজা—যে দুজন সার্ফ রাইডিং করছিল তাদের হাবভাব দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে আরো মনে হচ্ছিল, থেকে-থেকে তারা যে জলে আছাড় খাচ্ছে আর হাবুডুবু খাচ্ছে, তাতেও কম মজা পাচ্ছে না।

আমরা স্থির করেছিলুম, সেইদিনই সুইডেনে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সুতরাং সমুদ্রতীরে বেশী বেলা না করে বেরিয়ে পড়লুম। ডেনমার্ক আর সুইডেনের মাঝখানে এক ফালি সমুদ্র। সমুদ্র যেখানে সব চেয়ে সরু হয়ে এসেছে সেইখানেই পারাপারের জাহাজ। সেইখানকে লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়লুম আমরা হেঁটে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না। হাঁটতে হাঁটতে মিরেকের পিঠঝুলির পিছনের থলিটা থেকে ম্যাপটাকে টেনে বার করতে গেছি, সেই থলির মধ্যে ছিল বলটা, সেটা গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। একেবারে রাস্তার মাঝখানে! সেই সময় রাস্তা দিয়ে খুব জোরে একটা মোটার আসছিল—রাস্তার উপর লালের উপর সবুজের কাজ করা বলটাকে দেখতে পেয়ে, বোধ হয় বলটাকে বাঁচাবার জন্যেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভারের এই অদ্ভুত বদান্যতার কথা ভাবতে ভাবতে বলটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি চালক নিজে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে আমাদের আহ্বান করছেন। আমরা মন্ত্রচালিতের মতো বলটা কুড়িয়ে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলুম এবং ধন্যবাদ জানালুম। কিসের জন্যে যে তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম—লালের উপর সবুজ কাজ করা বলটা বাঁচাবার জন্যে না আমাদের গাড়িতে আহ্বান করার জন্যে তা আমরা আজও জানি না। আরো একটা জিনিস আমরা জানি না, কারণ মিরেক বা আমি কেউই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করিনি—তিনি বলটা দেখে গাড়ি থামিয়েছিলেন না আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়েছিলেন।

যাই হোক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠেই নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী, কর্মোপলক্ষে চলেছেন হেলসিংওর। আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—আমরাও যাচ্ছি হেলসিংওর। জাহাজ ধরতে।

—জাহাজ ধরতে কেন? সুইডেনে যাবেন বুঝি? তা বেশ, হেলসিংওরএ হ্যামলেটের প্রাসাদটা দেখে যাবেন তো?

আমরা বল্লুম—সে তো আমরা কাল দেখে নিয়েছি। ডেনমার্কের পর্ব আমাদের শেষ। এখন চলেছি সুইডেনে।

বলে বুঝলুম বড় ভুল করেছি। ভদ্রলোকের দেশপ্রীতির কোথায় যেন ঘা দিয়ে বসেছি। তিনি বল্লেন—আপনারা কবে ডেনমার্কে এসেছেন ?

মাত্র ছ'দিন ডেনমার্কে থেকে চলে যাচ্ছি শুনে তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—তবে যাবার আগে 'হিলেরড'-এর প্রাসাদটা দেখে যান। হ্যামলেটের প্রাসাদের থেকে কিছু কম নয়। জানেন তো ডেনমার্কের এই সব ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলি বড় সুন্দর।

আমরা কিছুই জানতুম না, তাই বল্লুম—হুঁ। ভদ্রলোক গাড়িতে ব্রেক কষলেন। আমি তাড়াতাড়ি ম্যাপ খুলে দেখি হিলেরড একেবারে উল্টো দিকে। হাঁ হাঁ করে বলে উঠলুম—আরে করেন কি, এ যে একেবারে বিপরীত দিকে যেতে হচ্ছে।

আর করেন কি! ততক্ষণে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে আমরা চলতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রলোক বল্লেন—কিছু ভাববেন না। হেলসিংওর থেকে অনেক স্টীমার যাচ্ছে। বিকেল বেলা বেশ আরাম করে সমুদ্র পার হবেন। হিলেরড-এর ফ্রেডেরিকবুর্গ প্রাসাদ না দেখে চলে গেলে আপনাদের ডেনমার্ক দেখাই বৃথা হত।

আমাদের আর কিছু বলবার ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ফ্রেডেরিকবুর্গ প্রাসাদের দরজায় এসে পৌঁছলুম। পরিখায় ঘেরা প্রকাণ্ড সেকেলে রাজপ্রাসাদ। পরিখার জলের মধ্যে সারি সারি থামের ছায়া পড়েছে। তখনকার দিনের রাজন্যরা এই সব দুর্গের মতো প্রাসাদে থেকে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করে গেছেন। এখন এ সবই মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। সামান্য দক্ষিণা দিয়ে সাধারণ লোকে এই সব মিউজিয়াম দেখতে আসে।

আমাদের নামিয়ে দেশভক্ত ডেনিশ ব্যবসায়ীটি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন আর বলে গেলেন—আপনাদের হয়তো ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক লাগবে এই প্রাসাদ দেখতে। এখান থেকে হেলসিংওর ফিরে বেলা চারটের সময় একটা

জাহাজ পাবেন সুইডেনে যাবার। বিদায়। আশা করি আবার আপনাদের দেখা পাবো কখনো।

আমরা বল্লুম—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

ভদ্রলোক বল্লেন—যে কোনো চলন্ত গাড়িকে হাত দেখাবেন, থেমে যাবে। কোনো চিন্তা নেই, আপনাদের দেখেই বোঝা যায় বিদেশী ছাত্র বলে। বিদেশী ছাত্রদের আমরা খুব পছন্দ করি।

ভদ্রলোক চলে যেতে আমি মিরেককে বল্লুম—মিরেক, সর্বনাশ হয়েছে। বিদেশী ছাত্র হিসেবে আমরা এদেশে মার্কা-মারা হয়ে গেছি। চলো, যত তাড়াতাড়ি পারি এখন পালানো যাক।

মিরেক বল্লে—এই ঐতিহাসিক প্রাসাদটা দেখে তবে তো?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, এইটে দেখে তারপর আর এক মুহূর্ত নয়।

কামরার পর কামরা, আসবাবপত্র আর দেয়ালে টাঙানো ছবি আর পর্দা দেখে আর আমাদের ভালো লাগছিল না। মন পড়ে ছিল দরোয়ানের কাছে জমা দেওয়া পিঠঝুলিতে। আর সেই পিঠঝুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখ চলে গিয়েছিল অজানা মাঠের অজানা পথে, অজানা গাছতলায় কোথায় কত দূরে কে জানে! কিন্তু যাদের দেশের ঐতিহাসিক সম্পদ এই সব সুদৃশ্য স্থাপত্য তাদের দেশের দরোয়ানের মনে তো কষ্ট দেওয়া যায় না তাড়াহুড়ো করে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে। কাজেই হিলেরড প্রাসাদের অভ্যন্তরে আরো প্রচুর দর্শকদের সঙ্গে আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরলুম।

তারপর দরোয়ানের কাছে পিঠঝুলি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি, এমন সময় সে একটা লালের উপর সবুজের কাজ করা রবারের বল আমার হাতে দিয়ে বল্ল—এই বলটা একজন ভদ্রলোক এইমাত্র দিয়ে গেলেন আপনাদের দিতে। এটা নাকি আপনারা তাঁর গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন।

বলটা দেখেই আমরা চিনলুম। মিরেকের পিঠঝুলির পিছনের খাপে বোতামটা লাগানো হয়নি, তাতেই হয়তো বলটা গড়িয়ে গাড়িতে পড়ে

গিয়ে থাকবে। কিন্তু ভদ্রলোকও তো আচ্ছা! এই চার আনার একটা বলের জন্যে হেলসিংওর থেকে ফিরে এলেন?

আমরা বলটা আর একবার পিঠঝুলিতে ভরছি, এমন সময় দরোয়ান বলে উঠল—হয়তো সে ভদ্রলোক এখনও এখান থেকে যাননি। ঐ দিকের দোকান থেকে ছবির পোস্ট-কার্ড কিনছিলেন দেখছিলুম। গিয়ে একবার দেখতে পারেন।

গিয়ে সত্যিই দেখা মিলল। ভদ্রলোক বল্লেন—ভালই হোলো। বলেছিলুম, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। তাই হোলো। চলুন তাহলে আপনাদের হেলসিংওরএ পৌঁছে দিই।

আমরা বল্লুম—সে কি? আপনি আবার হেলসিংওরএ যাচ্ছেন নাকি?

—যাচ্ছিলুম কোপেনহাগেন। কিন্তু আপনাদের দেখে মনে করছি উল্টো দিকেই যাই।

আমরা বল্লুম—আপনার কপালে দেখছি আজ কেবলই উল্টো যাত্রা।

ভদ্রলোক বল্লেন—ঠিক বলেছেন। দেখুন না, হেলসিংওরএও ঐ কাণ্ড। ওখানে গিয়েছিলুম আমি যার কাছ থেকে কাঁচা মাল কিনি তাকে দামটা দিতে। তার দেখা পেলুম না। উল্টে তার দোকানে আমার এক পাইকারী খদ্দের ছিল—সে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তার পাওনার টাকাটা দিয়ে গেল।

আমরা হো-হো করে হাসতে হাসতে ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠে বসলুম।

রাস্তায় যেতে যেতে ভদ্রলোকের সঙ্গে নানা গল্প হল। ডেনমার্কের সমবায় প্রথার কথা তিনি আমাদের বোঝাতে লাগলেন। পৃথিবীর যে যে দেশে সমবায় প্রথা সাফল্যলাভ করেছে তার মধ্যে ডেনমার্ক প্রধানতম। কৃষিতে বিরাট বিরাট সমবায়, শিল্পে সমবায়, হোটেলের সমবায়, দোকানের সমবায়, সব জায়গাতেই সমবায়। ডেনমার্কের বিরাট বিরাট গো-সমবায়ে এত দুধ তৈরী হয় যে সারা দেশে দুধ সরবরাহ করে, বিদেশে রপ্তানি করেও

প্রচুর দুধ উদ্বৃত্ত থাকে। এই কথাটা যখন বলছেন তখন আমরা একটি ছোট শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। হঠাৎ ভদ্রলোক বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁ করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে এক তেমাথায় গাড়িটাকে দাঁড় করালেন। বল্লেন—আসুন আমি যা বলছিলুম, এইখানেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন। মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে আপনারা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।

বলে আর কথা বলবার অবসর না দিয়েই আমাদের নিয়ে এক কফিখানায় ঢুকলেন। দুটো কফি আর নিজের জন্যে একটা গরম চকোলেটের ফরমাস দিয়ে ভদ্রলোক মুখে একটু স্মিতহাস্য ফুটিয়ে চুপটি করে বসে রইলেন। কি হয় দেখবার জন্যে আমরাও মুখ বুজে রইলুম।

দু 'পট্' কফি, এক 'পট' চকোলেট চিনি, ছোট ছোট তিন জগ দুধ, তা ছাড়া প্রকাণ্ড এক আড়াই-সেরী জগে আরো এক জগ দুধ এলো। আমরা কফি খাওয়া শেষ করতেই ভদ্রলোক সেই বিরাট জগটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—নিন্ এবার দুধ খান। এই হচ্ছে আমাদের দেশের বাড়তি দুধ, এর জন্যে রেস্তরাঁতে আলাদা দাম দিতে হয় না। দেশের বাড়তি দুধের এইভাবে আমরা সদ্ব্যবহার করি।

আমরা একেবারে তাজ্জব। ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে বসে সেইখানে ডেনমার্কের খাঁটি ঘন বাড়তি দুধ দু'তিন পেয়ালা খেতেই হল। ভদ্রলোক নিজেও খেলেন তারিফ করে।

এই অতুলনীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে এতটা পরিচিত হওয়ায় আমরা সেদিন নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলুম। কারণ এঁর সঙ্গে আলাপ না হলে এবং এঁর সঙ্গে সেই পথপ্রান্তের কফিখানায় কফি খেতে না ঢুকলে ডেনমার্কের আসল গৌরবই আমাদের অজানা থেকে যেত।

॥ ৩ ॥

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেনমার্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সুইডেন-যাত্রী জাহাজে চড়ে বসলুম। সেদিনকার সোনালী রোদের আলোয় সমুদ্রের নীল ঢেউগুলি বড় নরম, বড় মোলায়েম দেখাচ্ছিল। নীল আকাশের পটে দলে দলে গাং-চিল শাদা পাখনা মেলে উড়ে চলেছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে—তাদের সুতীক্ষ্ণ ডাক কানে এসে লাগছে। ডাকটার মধ্যে এমন একটা কি ভাব আছে যা চোখ বুজে শুনলেও চোখের সামনে দিগন্তব্যাপী বিরাট জলের মূর্তি ভেসে ওঠে। সারা পৃথিবীর সমুদ্রতীরে এই পাখির দল ছড়িয়ে। এরা না থাকলে কোনো সমুদ্রযাত্রাই সম্পূর্ণ হয় না।

আমাদের স্বল্পপরিসর সমুদ্র কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। ওপারে আমরা সুইডেনে 'হেলসিং ফোর্স'-এর ঘাটে নামলুম। আমার ইংরেজ বন্ধু হিলারি আমায় বলেছিল, সুইডেনের গ্যোটা খালের কথা। সুইডেনের পশ্চিম উপকূল গ্যোটেবুর্গ থেকে পূর্ব উপকূল স্টকহলম পর্যন্ত এই খাল —স্টীমারে করে পার হতে আড়াই দিন লাগে। আমাদের অবশ্য সমস্ত খালটা পার হবার মতো অত অর্থ ছিল না। গ্যোটা খালের শৌখিন স্টীমারে খরচ বড় বেশি। তাই আমরা স্থির করেছিলুম—অর্ধেকটা খাল পাড়ি দেব। মাঝামাঝি জায়গা থেকে উঠে স্টীমারে করে স্টকহলম পর্যন্ত যাবো। এই উদ্দেশ্যে আমরা খালের ধারে 'য়োন্‌শোপিং' নামক এক শহরে যাবার ট্রেনের টিকিট কিনলুম—এটা গ্যোটা খালের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে।

ভ্যাটার্ন হ্রদ-তীরে য়োনশোপিং। য়োনশোপিং, ভ্যাটার্ন হ্রদ—বার বার নামগুলো যেন মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। কোথায় যেন

বহুদিন আগে শুনেছি এ নামগুলো। বহু পুরোনো স্মৃতির মধ্যে ঝাপসা একটা ছবি থেকে থেকে জেগে উঠছে। ম্যাপটা খুললুম। দক্ষিণ সুইডেনের যে অংশে ভ্যাটার্ন হ্রদ সেখানে চোখ বুলিয়ে চললুম। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ল। কতকাল আগে পড়েছিলুম, ভুলেই গিয়েছিলুম প্রায়। এইবার ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল 'সেলমা লেগারলফ্'-এর এক বিখ্যাত উপন্যাসের কথা।

ট্রেনে উঠতে উঠতে মিরেককে জিজ্ঞেস করলুম—মিরেক, তুমি সুইডিশ লেখিকা লেগারলফ্-এর একটি উপন্যাস পড়েছ—নিল্‌স্-এর অ্যাডভেঞ্চার?

মিরেক বললে—কই না তো!

আমি বললুম—বইটার কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু ভাবতে ভাবতে গল্পটা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুইডেনে যারা বেড়াতে আসে, তাদের পক্ষে পড়বার মতো এমন সুখপাঠ্য বই আর হতে পারে না।

মিরেক বললে—তবে তো ফিরে গিয়েই বইটা পড়ে ফেলতে হবে।

আমি বললুম—তা যখন পড়তে চাও, আমি আগে থেকে গল্পটা বলে দিতে চাই না। কিন্তু আমরা সুইডেনের যে অংশে এখন চলেছি ঠিক সেই জেলার একটি চমৎকার উপাখ্যান বই-এর এক জায়গায় আছে, শুনবে?

মিরেক বললে—রেলে সময় কাটাবার পক্ষে স্থানীয় উপকথার মতো শ্রোতব্য বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তুমি শুরু কর।

সমুদ্রতীর ত্যাগ করে আমাদের ট্রেন তখন আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে হেলে-দুলে এগিয়ে চলেছে। জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে আমি গল্প শুরু করলুম।

সুইডেনের ম্যাপ খুলে দেখ, এদেশের দক্ষিণতম জেলার নাম হচ্ছে 'স্কোনে'। এইখানেই ছিল নিল্‌স্-এর বাড়ি। নিল্‌স্ হাঁস চরাতো। একবার সে গ্রীষ্মের সময় দূরের এক গ্রামে হাঁস চরাবার কাজ পেয়েছিল। সেইখানে প্রায় প্রতিদিনই তার দেখা হতো তারই সমবয়সী দুটি ছোট ছেলে মেয়ের

সঙ্গে। তারা ছিল ভাই আর বোন। স্কোনের উত্তরে 'স্মোলাণ্ড' জেলা থেকে তারা এখানে এসেছিল। ভাই-এর নাম ছিল ম্যাট্‌স্, বোনের নাম ওসা।

ম্যাট্‌স্ একদিন নিল্‌স্‌কে বললে—নিল্‌স্, তোমাদের জেলা স্কোনে আর আমাদের জেলা স্মোলাণ্ড কি করে তৈরি হল তার গল্প জানো?

নিল্‌স্ যেই না বলা—না—অমনি ম্যাট্‌স্ তার মুখে মুখে শোনা উপন্যাস আরম্ভ করে দিলে।

বহুদিন আগেকার কথা। সৃষ্টিকর্তা তখন পৃথিবী সৃষ্টি করছিলেন। কাজে মগ্ন আছেন, সেই সময় মহর্ষি পীটার সেখানে এসে হাজির। পীটার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাজ দেখতে লাগলেন, তারপর বললেন—কাজটা খুব শক্ত নাকি? ঈশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন—খুব সহজ তো নয়ই। মহর্ষি পীটার আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। একটার পর একটা পাহাড় পর্বত নদী নালা বন মাঠ কেমন ফস্‌ফস্ করে হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁরও মনে ইচ্ছে হল, তিনিও সৃষ্টি করবেন। মহর্ষি পীটার বললেন—দেখুন ঈশ্বর, আপনি হয়তো ক্লান্তি বোধ করছেন, একটু বিশ্রাম করবেন? আমি ততক্ষণ আপনার হয়ে কিছু কাজ এগিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু ঈশ্বর রাজী হলেন না। তিনি বল্লেন—দেখ মহর্ষি, এ কাজে তো তুমি দড় নও। আমি যেখানে ছাড়ব সেখান থেকে তুমি আরম্ভ করে ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

মহর্ষি পীটার গেলেন চটে। বললেন—হুঁঃ, দেশ সৃষ্টি করাটা কি আর এমন শক্ত কাজ? তিনিও ভালো ভালো দেশ তৈরি করতে পারেন।

হবি তো হ' ঈশ্বর সেই সময় স্মোলাণ্ড জেলায় সবেমাত্র হাত দিয়েছেন। আধখানাও তৈরি হয় নি—কিন্তু ঐটুকুতেই মনে হচ্ছে যে, আশ্চর্য সুন্দর এবং অতি উর্বর একটা দেশ তৈরি হচ্ছে। মহর্ষি পীটারকে চটাতে স্বয়ং ঈশ্বরও ভয় পেতেন, তা ছাড়া তিনি ভাবলেন, কাজটা যখন এত ভালোভাবে আরম্ভ হয়েছে পীটার এখন চেষ্টা করলেও একে খারাপ করতে পারবেন

না। কাজেই তিনি বললেন—দেখ পীটার, এক কাজ করা যাক। দেখা যাক আমাদের দুজনের মধ্যে কে এই সৃষ্টির কাজ ভাল বোঝে। তুমি নতুন লোক, তুমি বরং আমার এই আধশেষ করা দেশটাকে সম্পূর্ণ করে তোলো; আর আমি কয়েকটা নতুন দেশ সৃষ্টি করতে যাই।

পীটার রাজী হলেন। দুজনের কাজ আরম্ভ হল। সৃষ্টিকর্তা একটু দক্ষিণে সরে গেলেন; সেখানে গিয়ে তিনি স্কোনে জেলা তৈরি করায় হাত দিলেন। ঈশ্বরের কাজ যখন সারা হল, ঈশ্বর পীটারকে ডেকে বললেন—তোমার কাজ কতদূর এগলো? দেখে যাও আমার জেলা কেমন হয়েছে।

পীটার বললেন—আমি তো অনেকক্ষণ কাজ সেরে হাত গুটিয়ে বসে আছি। পীটারের গলার স্বরে ঈশ্বর বুঝলেন, পীটার নিজের কাজ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।

পীটার এসে স্কোনে জেলা পরিদর্শন করলেন এবং স্বীকার করলেন, দেশটা সবদিক থেকে নিখুঁত হয়েছে। উর্বর মাটি সহজেই চাষ করা যাবে। বড় বড় সমতল মাঠ, প্রচুর জল, পাহাড়-পর্বত নেই বললেই চলে। মানুষ যাতে সত্যিই সুখে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে ভগবান একটুও কার্পণ্য করেন নি। পীটার বললেন—সত্যিই চমৎকার দেশ গড়েছেন সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার গড়া দেশটি আরো সুন্দর হয়েছে।

ঈশ্বর বললেন—বেশ চলো তবে দেখা যাক।

কিন্তু স্মোলাণ্ডের সামনে এসে ঈশ্বর এমনই হক্‌চকিয়ে গেলেন যে, প্রথমটা তাঁর মুখে কোনো কথাই যুগোলো না। একটু সামলে নিয়ে তিনি পীটারের মুখের দিকে চেয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললেন—পীটার কি কাণ্ড করেছ?

ঈশ্বরের কথায় চমকে পীটার চারিদিকে চোখ বোলালেন এবং যা চোখে পড়ল তা দেখে তিনি অবাকই হয়ে গেলেন। মহর্ষি পীটার ছিলেন শীতকাতুরে। তাই তাঁর ধারণা ছিল, দেশকে যত গরম করা যায় ততই ভাল। তিনি যেখানকার যত চাংড়া চাংড়া পাথর এনে স্মোলাণ্ডের উপর বোঝাই করে

যতটা পারেন দেশটাকে সূর্যের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর সেই পাথরের উপর এক স্তর মাটি বিছিয়ে দিয়ে কাজ সেরে দিলেন। কাজ সেরে তাঁর ধারণা হল এমন সুন্দর দেশ আর হয়না।

এদিকে পীটার যখন স্কোনেতে গিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি দেখতে ঠিক সেই সময়েই স্মোলাণ্ডের উপর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এবং পীটারের দেওয়া মাটির পলেস্তারা ধুয়ে হয়ে গেল সাফ। কাজেই ভগবান যখন স্মোলাণ্ড দেখতে এলেন, তিনি দেখলেন, চারিদিকে শুধু পাথর আর পাথর, মাটির চিহ্নই নেই কোনোখানে। একটিমাত্র জিনিস চারিদিকে প্রচুর—তা হচ্ছে জল আর জল। পাথরের গায়ে যে সব বড় বড় ফাটল আর গর্ত ছিল সব জলে ভরে গেছে। চারিদিকে শুধু হ্রদ নদী আর ঝরণা আর বড় বড় জলা।

ভগবান বললেন—বলো মহর্ষি পীটার, এই দেশ তুমি কি উদ্দেশ্যে গড়লে ?

পীটার তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। এ কথা বলেন, ও কথা বলেন, শেষে বললেন—দেশটাকে সূর্যের উত্তাপ দেবার জন্যে উঁচু করে গড়েছি—যাতে সূর্যের একটু কাছাকাছি হয়।

ঈশ্বর বললেন—সর্বনাশ! দিনের বেলার কথা ভেবেছ মহর্ষি, রাতের কথা ভাবো নি ? সূর্য যখন থাকবে না, এত উঁচুতে রাতের হিমে যে সব কিছু জমে যাবে। নাঃ, এ দেশে কোনো কিছুই ফলবে বলে মনে হয় না। সামান্য যদি কিছুও বা হোতো শীতে তা-ও মরে যাবে।

পীটারের মাথায় এ কথাটা আগে আসে নি, কাজেই তিনি মাথা হেঁট করে রইলেন।

গল্পটা যখন এতখানি বলা হয়েছে, ম্যাট্‌স্‌-এর বোন ওসা আর থাকতে না পেরে বললে—দেখ্ ম্যাট্‌স্‌, স্মোলাণ্ডের তুই এত নিন্দে করবি এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। স্মোলাণ্ডে কি চাষের জমি নেই নাকি ? কত চমৎকার সুন্দর জমি রয়েছে। কেন, কাল্‌মার-এর কাছে 'মোরে' পরগণা ?

সেখানে মাঠের পর মাঠে যখন ফসল ধরে তখন তার কাছে স্কোনের মাঠ লাগে কোথায়? এমন ফসল নেই যা মোরে পরগনায় জন্মায় না!

ম্যাট্‌স্ বললে—তা আমি কি করব? সকলে যেমন করে স্মোলাণ্ডের গল্প করে, আমিও তাই করছি।

ওসা বললে—কেন, আমিও তো অনেকের মুখে শুনেছি 'টিউস্ট' উপকূলের মতো অমন সুজলা সুফলা জমিই কোথাও নেই।

ম্যাট্‌স্ বললে—তা ঠিক বটে।

ওসা বলে চললো—মাস্টারমশাই কি পড়াচ্ছিলেন, মনে নেই? তিনি বলছিলেন, ভ্যাটার্ন হ্রদের দক্ষিণে স্মোলাণ্ডের যে অংশ তার মতো সুন্দর দৃশ্য সারা সুইডেনের কোথাও দেখা যায় না। ভেবে দেখ দেখি, ছবির মতো ভ্যাটার্ন হ্রদ—দু পাশে হলুদ বরণ পাহাড়, তার কোলে য়োনশোপিং আর তার দেশলাইয়ের কারখানা। একটু দূরেই 'হুস্ক্‌ভার্না' শহর, সেখানেও বা কত কারখানা। স্মোলাণ্ডকে তুমি গরিব জেলা বলতে চাও?

ম্যাট্‌স্ আবার বললে—হ্যাঁ, এগুলোও সত্যি বটে।

ওসা বলে চললো—এ ছাড়া আরো আছে। ইমোন নদী যেখান দিয়ে বয়ে চলেছে তার দুপাশে কত গ্রাম, কত ময়দার কারখানা, কত করাতের কারখানা।

ম্যাট্‌স্ এবারে একটু বিপদে পড়েছে বলে মনে হল, সে আমতা-আমতা করে বললে—তাও ঠিক বটে।

তারপর হঠাৎ ম্যাট্‌স্ লাফিয়ে উঠল। বললে—আমরা আচ্ছা বোকা তো! ওসব জায়গাগুলো তো ভগবানের স্মোলাণ্ড। পীটার আসবার আগেই ভগবান এসব করে রেখেছেন। কিন্তু মহর্ষি পীটারের স্মোলাণ্ডে একবার যাও দেখি—ঠিক গল্পে যেমন আছে হুবহু তেমনি দেখবে। এই বলে সে তার গল্পের ছেঁড়া খেই ধরে আবার কাহিনী শুরু করলে।

ভগবান যখন পীটারের কীর্তি দেখলেন, এবং যখন দেখলেন তাঁর নিজের সৃষ্টিকে পীটার তছনছ করে দিয়েছেন, তাঁর খুবই দুঃখ হল। কিন্তু মহর্ষি পীটার

তখনও নিজের প্রতি আস্থা হারান নি। তিনি ঈশ্বরকে স্তোক দিয়ে বললেন—আপনি একটুও দুঃখ করবেন না। দেখুন আগে এখানকার বাসিন্দাদের কেমন করে আমি তৈরি করি। আমার গড়া মানুষেরা জলার মধ্যেই চাষ করবে। তারা পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে চারিদিকে সোনার ফসল ফলিয়ে দেবে।

ঈশ্বর আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তিনি বললেন—যথেষ্ট হয়েছে। তুমি স্কোনেতে যেতে পারো। স্কোনেকে আমি বহু পরিশ্রমে সুজলা সুফলা করে সাজিয়েছি—তুমি সেখানে গিয়ে স্কোনের বাসিন্দা সৃষ্টি কর। স্মোলাণ্ডে যারা থাকবে, তাদের গড়ার ভার আমার উপর। এই বলে ভগবান স্মোলাণ্ডবাসীদের সৃষ্টি করতে লেগে গেলেন। তারা হল দক্ষ, পরিশ্রমী হাসিখুসী, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং মিতব্যয়ী। এমনভাবে তারা তৈরি হল যাতে করে স্মোলাণ্ডের মতো জেলায় তারা নিজেদের পেটের ভাত যুগিয়ে নিতে পারে।

এই বলে ম্যাট্‌স্‌ চুপ করলে।

নিল্‌স্‌ আর থাকতে পারলে না। সে জিজ্ঞেস করলে—আর স্কোনেবাসীরা?

ম্যাট্‌স্‌ বললে—সে তো তুমি নিজেই বলতে পারবে। বলে নিল্‌স্‌-এর দিকে এমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো যে নিল্‌স্‌ একেবারে জ্বলে উঠলো।

তখনই লেগে গেল হাতাহাতি। ভাগ্যিস ওসা মাঝখানে ছিল তাই রক্ষে, নইলে সেইদিনই স্কোনেবাসী আর স্মোলাণ্ডবাসীর খণ্ড-যুদ্ধের এক ভয়াবহ পরিণাম ইতিহাসে লেখা থেকে যেত।

এইখানে গল্প শেষ করে আমি মিরেককে বললুম—কি রকম গল্পটা?

মিরেক বললে—চমৎকার! সেল্‌মা লেগারফ কোথায় থাকেন? সুইডেনে এসেছি যখন, খুঁজে একবার বার করতে হবে। কি বল?

আমি বললুম—ঠিক বলেছ।

আমাদের ট্রেন এসে য়োনশোপিং-এ পৌছল। পিঠঝুলি নিয়ে আমরা

নেমে পড়লুম। সত্যি ভারি সুন্দর শহর এই য়োনশোপিং। ছোট্ট শহর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হ্রদের নীল জলে যেন সবে গা ধুয়ে উঠে এসেছে। সেখানকার যুথ হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে আমরা স্টীমারের খোঁজ নিতে গেলুম। খোঁজ নিয়ে জানলুম তিন দিনের দিন একটা স্টীমার য়োনশোপিং-এ এসে পৌঁছবে এবং তাতে করে আমরা ভ্যাটার্ন হ্রদ ও গ্যোটা খালের মধ্যে দিয়ে স্টকহলম-এ পৌঁছতে পারব। সুতরাং তিন দিন য়োনশোপিংএ থাকা স্থির হল।

পরের দিন ভোরবেলা উঠে স্নানের ঘরে দাড়ি কামাচ্ছি, এমন সময় একটি বিদেশী ছেলে এসে বললে—আপনার কাছে একটা বাড়তি ক্ষুরের ফলা হবে?

আমি বললুম—নিশ্চয়ই হবে। আমার পিঠঝুলি থেকে বার করে একটা ক্ষুরের ফলা তাকে দিলুম। তারপর দাড়ি কামাতে কামাতে তার সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটির বাড়ি ডেনমার্কে। বাড়ি থেকে এখান অবধি লাফা-যাত্রা করতে করতে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কত দিন লাগল?

ছেলেটি বললে—তা তো হিসেব করি নি। তবে কয়েকটা দিন লেগেছে বটে।

এরকম ধরনের উত্তর শুনব বলে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। বরাবর দেখে এসেছি ইয়োরোপের লোকেরা হিসেবী মানুষ। এ আবার কি রকম লোক? তখন মনে হল, আচ্ছা এতদিন ইয়োরোপে আছি, কই আজ অবধি কেউ তো আমার কাছে দাড়ি কামাবার জন্যে ক্ষুরের ফলা ধার চায় নি। দেশে এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাতুম না। এর মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এ কথা মনেই হত না। কিন্তু এখানে এই য়োনশোপিং শহরে এই ডেনিশ সাহেবের কথাবার্তাগুলো শুনে আমার বেশ তাজ্জব লাগল। আরও ভাব জমিয়ে ফেললুম। বললুম—আপনি লাফা-যাত্রা করছেন কেন?

ছেলেটি বললে—শুনুন তবে বলি। আপনি ইটালিয়ান ভাষা জানেন?

আমি বললুম—কিছুই জানি না।

ছেলেটি বললে—জানলে বুঝতেন। আমার পিঠ-ঝুলিতে একটি বই আছে। একজন ইটালিয়ান কবির লেখা। এই দেখুন বইখানা। বলে আমার হাতে বইটা দিলে দেখতে।

আমি দেখলুম একখানি কবিতার বই। বুঝলুম না অবশ্য কিছুই।

ছেলেটি বললে—এই ইটালিয়ান কবি গত বছর গ্রীষ্মকালে ইটালি থেকে লাফা-যাত্রা করে সুইডেনে এসেছিলেন। সারা সুইডেন ঐভাবেই ঘুরেছিলেন। ছন্দে লিখেছেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতা। এরকম আশ্চর্য বই খুব কমই লেখা হয়েছে।

আমি তখন বুঝলুম। বললুম—এই বই পড়েই তাহলে আপনি সুইডেন দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন?

ছেলেটি বললে—এরকম কবিতা পড়ে কেউ যদি তখনই বেরিয়ে না পড়ে লাফাযাত্রা করতে, তাহলে বুঝবেন সে কাব্যরসের কিছুই পায় না।

আমি বললুম—তা তো বুঝলুম। কিন্তু আপনি কি এর আগে লাফা-যাত্রা করেছেন?

সে বললে—কোনো দিনও নয়। তাছাড়া ডেনমার্কে আমাদের নিজেদের জেলার বাইরেই আমি কোনোদিন যাই নি।

আমি বললুম—সুইডেনে লাফা-যাত্রা কেমন চলে? আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ছেলেটি বললে—অসুবিধে খুবই হচ্ছে। বেশির ভাগ মোটার গাড়িই থামছে না। প্রায়ই মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। এদিকে আমার বুট-জোড়াটা বাড়িতেই ফেলে এসেছি না পথেই কোথাও হারিয়ে গেছে জানি না। এখন আমার একমাত্র সম্বল এই স্যাণ্ডেল। ভাগ্যিস কয়েকটা মোটা মোটা মোজা আছে, নইলে হাঁটতেই পারতুম না।

এরকম ভোলা-ভোলা কবি-কবি মানুষ সত্যি বলছি ইয়োরোপে আমি

এর আগে কোনোদিন দেখি নি। আমি বললুম—এত অসুবিধার মধ্যেও আপনি লাফা-যাত্রা করে যাবেন ?

সে হঠাৎ দাড়ি কামানো থামিয়ে পিঠ-ঝুলি থেকে সেই কবিতার বইটা আরেকবার একটানে বার করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে—এরই জোরে চলব। যখনই মোটার গাড়িতে জায়গা পাই না, পা-ও অবশ হয়ে আসে, এই কাব্য আমায় চালিয়ে নিয়ে চলে। এর মধ্যে আছে সমস্ত চলমান পৃথিবী। শুনুন শুনুন এইখানটা।

বলে সাবান-মাখা মুখে, আধ-কামানো অবস্থায় এক হাতে 'সেফটি' ক্ষুর অন্য হাতে সেই অমর কাব্য ধরে গড়গড় করে পড়ে যেতে লাগল। আমি যে একবর্ণও বুঝলুম না তাতে বিন্দুমাত্র এসে গেল না।

কবিতা শেষ হবার আগেই আমার দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি গেলুম মিরেকের খোঁজে। মিরেক য়ুথ হস্টেলের সাধারণের রান্নাঘরে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে ডিম ভাজছিল। মিরেককে বললুম সেই ডেনিশ কাব্যিক ছেলেটির কথা।

মিরেক শুনে বললে—এঁর সঙ্গে তো আজ ভোরেই আমার আলাপ হয়েছে।

আমি বললুম—কি রকম ?

মিরেক বললে—কলতলায় সাবান দিয়ে আমার মোজা কাচছি, হঠাৎ ঐ ছেলেটি এসে একটু সাবান ধার চাইল। আমি সাবানটা দিলুম। তারপরে আর লক্ষ্য করিনি—ভেবেছিলুম সাবান দিয়ে হাত-টাত ধোবে হয়তো। কি সর্বনাশ, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, তার দাঁতের বুরুশে আমার সাবান লাগিয়ে দিব্যি দাঁত মাজছে। দেখে আমি এমনই হতভম্ব হয়ে গেলুম যে আমার মুখে কোনো কথাই যোগাল না। পরে মনে হয়েছিল ছেলেটিকে আমার দাঁতের মাজন ধার দেবার কথা। কিন্তু আমার হতভম্ব ভাব কাটবার আগেই সে তার দাঁত মাজা শেষ করে আমার সাবান ফেরত দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

আমি বললুম—এরকম অপূর্ব চীজ ইয়োরোপে আর কটি আছে মিরেক ?

মিরেক বললে—আমি তো আমাদের দেশে একটিকেও দেখি নি।

আমি বললুম—আমার কিন্তু একে দেখে আমার দেশের স্বভো ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। চরিত্রের এরকম আশ্চর্য মিল সচরাচর দেখা যায় না।

মিরেক বল্লে—স্বভো ঠাকুর আবার কে ? রবি ঠাকুরের কেউ নাকি ?

এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েন দেখে আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললুম—না না, আমারই একজন আত্মীয়।

সকালের খাওয়া সেরে মিরেক আর আমি বেরিয়ে পড়লুম ভ্যাটার্ন হ্রদ দেখতে।

॥ ৪ ॥

একটা মনিহারীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছবির পোস্টকার্ড কিনছি, হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে দুর্বোধ্য ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন। সুইডিশ ভাষা আমাদের জানা না থাকলেও যতটুকু জ্ঞান ছিল তাতেই বুঝলুম ভদ্রলোক সুইডিশ ভাষায় কথা বলছেন না। আমরা চুপ করে শুনে যেতে লাগলুম। বুঝলম তাঁর কথা ক্রমে বক্তৃতার আকার ধারণ করছে। তারপর হঠাৎ তাঁর বক্তৃতা থেমে যায় এবং তিনি বেশ স্পষ্ট ইংরেজীতে বলেন—দেখছি আপনারা 'এস্‌পেরাণ্টো' বোঝেন না। আমি আপনাদের এস্‌পেরাণ্টো ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কোনদিকে যাচ্ছেন আপনারা ?

আমরা বললুম—হ্রদের ধারে বেড়াতে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন—চলুন তবে আমিও যাই। আশা করি কিছু মনে করবেন না। আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, কাজেই বুঝছেন তো আমার অবসর প্রচুর। আপনারা এখানে নতুন এসেছেন—আমি মনে করছি য়োন-শোপিং জায়গাটা আমি আপনাদের দেখাবো। কদিন থাকবেন এখানে ?

—পরশু গ্যোটা খালের স্টীমার এখানে আসছে, তাতে করে স্টকহলম যাবো স্থির করেছি।

—তা বেশ, এর মধ্যেই য়োনশোপিং দেখা আপনাদের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলুম। এস্‌পেরান্টো এক অপূর্ব ভাষা। এই ভাষার চল যেদিন সারা পৃথিবীতে হবে সেদিন মানুষের এক মহামিলনের দিন। মানুষে মানুষে ঝগড়া, ঈর্ষা, যুদ্ধ-বিগ্রহ সব কিছুর অবসান। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে যে এত দ্বন্দ্ব তার আসল কারণ নানা জাতির নানা ভাষা এটা মানেন তো?

আমি বললুম—না মেনে আর উপায় কি? বাইবেলেই তো সে গল্প আছে।

—তবেই বলুন, সব মানুষের এক ভাষা হলে কোনো গণ্ডগোলই আর থাকতো না। এই যে আমি এস্‌পেরান্টো বললুম অথচ আপনারা বুঝতে পারলেন না এতেই তো আপনারা আমার কাছে পর হয়ে গেলেন। অথচ ভাবুন দেখি, আপনারা কত দূর দেশ থেকে সুইডেনে এলেন, এখানে এসে যদি দেখতেন আপনাদেরই ভাষায় এদেশের লোক কথা বলছে, তাহলে সকলেই আপনাদের আপন হয়ে যেত, কেউ আর পর থাকতো না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে নানা ভাষার বদলে এক ভাষা থাকা দরকার। কোন ভাষা তাহলে পৃথিবীর ভাষা হবে? ইংরেজরা বলে ইংরেজী হোক, ফরাসীরা বলে ফরাসী হোক, সবাই নিজেদের ভাষা চাইবে—কিন্তু তা হলে তো আর চলে না। তাই শেষে এই এস্‌পেরান্টো ভাষার উৎপত্তি। এতে প্রায় সব ভাষারই কিছু কিছু আছে, ব্যাকরণটাকেও করা হয়েছে সোজা—কাজেই কারুর কিছু বলবার নেই। শুনবেন একটু এস্‌পেরান্টো? দেখবেন কেমন সুললিত সহজ ভাষা? মনে হবে যেন একান্ত নিজের। বিশ্বশান্তি বিষয়ে একটি ছোট বক্তৃতা দিই—

এই বলে ভদ্রলোক আবার এস্‌পেরান্টোতে বক্তৃতা শুরু করলেন। আমরা চলতে চলতে হ্রদের তীরে এক মনোরম জায়গায় এসে উপস্থিত

হলুম। তখন বিশ্বশান্তির বক্তৃতা শেষ হল। ভদ্রলোক তখন হাঁপাচ্ছেন। নিজেই বললেন—আমি এখানে একটু বসি। আপনারা বরং ঘুরে আসুন, যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।

আমরা পা বাড়াতেই তিনি বললেন—কই আমার বক্তৃতা কেমন লাগল বললেন না তো?

মিরেক বললে—চমৎকার হয়েছে। ফিরে এসে আবার একটা কিছু শুনবো আপনার মুখে।

ভদ্রলোক স্মিত হেসে বললেন—আশা করি আপনারা এস্‌পেরাণ্টো শেখবার জন্যে একটু চেষ্টা করবেন। পৃথিবীর শান্তিকামী লোকদের অধিকাংশই আজকাল এস্‌পেরাণ্টোর চর্চা করে। আন্তর্জাতিক এস্‌পেরাণ্টো সমিতির সভ্য প্রায় প্রত্যেক শহরে পাবেন। শুধু একবার বলা যে আমি এস্‌পেরাণ্টো জানি, তাহলেই পৃথিবীর যেখানেই যান, চেনা হোক, অচেনা হোক, অন্য সভ্যেরা আপনাদের দু বাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করবে।

আমরা নমস্কার করে হ্রদের ধারে যে পথ গেছে তাই ধরে এগিয়ে চললুম হ্রদের টলটলে নীল জলকে ডান পাশে রেখে।

আমি মিরেককে বললুম—মিরেক, এসপেরাণ্টোর বক্তৃতা শুনলে তো? বিশ্বশান্তির বিষয়ে কিছু বুঝলে?

মিরেক বললে—দেখ, বিশ্ব বলতে আমরা ইয়োরোপীয়েরা বুঝি ইয়োরোপকে। আর না হলে বড় জোর আমেরিকা পর্যন্ত। ঐ যে ভদ্রলোক বললেন সব ভাষা থেকে কিছু কিছু নিয়ে এস্‌পেরাণ্টো তৈরি হয়েছে, অথচ বলবার সময় একবারও ভাবলেন না, তুমি একজন ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার দেশের মতো অত বড় একটা দেশের ভাষার কোনো স্থান এস্‌পেরাণ্টোতে নেই। তবে আর ভারতের সঙ্গে মহামিলন হবে কি করে?

আমি আরো টিপ্পনি কাটলুম—তারপর মহাচীন, তারপর আফ্রিকা মহাদেশ, এরাই বা যায় কোথায়?

মিরেক বললে—হ্যাঁ, ও-সব তো আছেই। বিশ্বশান্তি না কচু! সম্পত্তি আছে, প্রচুর অবসর, তাদেরই পোষায় এস্পেরাণ্টো।

গলানো সোনার মতো রোদের আলোয় তখন মাঠঘাট, গাছপালা, আকাশ-বাতাস হাসছে—তখন কি আর এস্পেরাণ্টো মাথায় ঢোকে? হ্রদের জলের ছোট ছোট ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে তীরের উপর এসে পড়ছে যেন ভাঁজ করা কাগজের মতো যার একপিঠ নীল একপিঠ রূপোলী। কয়েকটি নৌকো পাল তুলে ভারি লঘু স্বরে জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। নৌকোর মানুষগুলিও যেন খুশিতে হালকা হয়ে উঠেছে। তাদের কথাবার্তা দু-একটা গানের কলি কানে এসে লাগছে। এই হ্রদের উপর দিয়ে স্টীমারে করে পাড়ি জমাতে যে কেমন লাগবে তা মনে করে আমরাও পুলকিত হয়ে উঠলুম। কাজেই হ্রদ ধরে বেশ কয়েক মাইল হাঁটবার পর আমাদের খেয়াল হল কতদূরেই না চলে এসেছি। মনে হল, তাই তো, হ্রদের ধারে বুড়ো লোকটি আমাদের জন্যে হয়তো এখনও বসে রয়েছেন!

তাড়াতাড়ি ফিরলুম। অনেকক্ষণ সময় লাগল অতটা পথ ফিরতে। কিন্তু ফিরে দেখলুম সেই এস্পেরাণ্টো-দক্ষ ভদ্রলোক আমাদের আশা ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে গেছেন। কাজেই আমরা ম্যাপ খুলে বালির উপর বসে পড়লুম কাল কোথায় যাওয়া যেতে পারে তাই দেখতে।

ভ্যাটার্ন হ্রদের মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে—ভিসিংস্ দ্বীপ। য়োনশোপিং থেকে কাছেই গ্রানা বলে একটি গ্রাম। সেইখান থেকে মনে হল দ্বীপে যাবার কোনো উপায় থাকতে পারে। হোস্টেলে ফেরবার পথে রেলের স্টেশনে গেলুম খবর করতে। রেলের অনুসন্ধান দপ্তরে ভিসিংস্ দ্বীপের রঙিন ছবি সংবলিত পুস্তিকা পেলুম বিনামূল্যে। ভিসিংস্ এক ঐতিহাসিক স্থান। ঐ অঞ্চলের জমিদার-বংশ আগেকার দিনে ঐ দ্বীপে তাঁদের প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, সেই প্রাসাদ দেখতে অনেক যাত্রী যায়। গ্রানা গ্রাম থেকে নৌকো যায় প্রায়ই—পারাপারের ভাড়া মাথা-পিছু এক আনা।

এই সব খবর সংগ্রহ করে ট্রেন কখন কখন ছাড়ে জিজ্ঞেস করে একটা

কাগজে লিখে নিচ্ছিলুম। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কে একজন ইংরেজীতে বলে উঠল—আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি কি ?

আমরা ফিরে দেখলুম বছর পঁচিশের একটি ছেলে।

ছেলেটি বললে—এখানে ভাষা বোঝবার যদি কিছু অসুবিধে হয় তো আমি দোভাষীর কাজ করে দিতে পারি। আমেরিকানরা এখানে এলে আমি প্রায়ই তাদের গাইড হই।

আমি কি রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—না, না, অনেক ধন্যবাদ। আমরা শুধু ট্রেনের সময় জেনে নিচ্ছিলুম, নেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ কেন জানি না তীর্থের পাণ্ডার কথা এবং পাণ্ডাদের জুলুমের কথা মনে পড়ে গেল।

ছেলেটি বললে—আপনারা কি ছাত্র ?

আমি বললুম—দুজনেই।

ছেলেটি বললে—তাহলে আপনাদের কাছ থেকে কোনো মূল্য নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আপনারা যদি দয়া করে আমাকে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করেন। আমিও ছাত্র। ছুটির সময় আমেরিকানদের পাণ্ডাগিরি করি—কিন্তু যখন হাতে আমেরিকান যাত্রী থাকে না তখন বিদেশী ছাত্র পেলে তাদের নিজের ভাইএর মতো করে য়োনশোপিং দেখিয়ে বেড়াই।

ছেলেটিকে এইবার বড় ভালো বড় সৎ বলে মনে হল। কিন্তু আমরা আর গাইড নিয়ে কি করব ? মিরেক বললে—দেখুন, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব ? কাল আমরা ভিসিংস্‌ দ্বীপে যাচ্ছি এবং পরশুই চলে যাচ্ছি য়োনপোশিং ছেড়ে।

ছেলেটি বললে—তবে বলি আপনাদের। ট্রেনে করে গ্রানা যাবেন না। অনেক আরামে যেতে পারবেন যদি লাফা-যাত্রা করে যান।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—লাফা-যাত্রা করা চলে এখানে ?

—কেন চলবে না ? সুইডেনে-নরওয়েতে লাফা-যাত্রা চলবে না তো চলবে কোথায় ?

আমরা বললুম—এ প্রস্তাব মন্দ নয়। দেখা যাবে কাল চেষ্টা করে।

ছেলেটি বললে—লাফা-যাত্রা হচ্ছে দেশ বেড়াবার এবং দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়। আজ বিদায়। হয়তো আবার একদিন আপনাদের সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যাবে।

আমরা বিদায় নিয়ে হোস্টেলে ফিরে গেলুম। মিরেক বললে—লাফা-যাত্রার প্রস্তাবটা কেমন লাগল?

আমি বললুম—আমার তো মনে হয় লাফা-যাত্রাই দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রাত্রে যখন খাচ্ছি সেই সময় কোথা থেকে এস্‌পেরাণ্টো বুড়ো এসে উদিত হলেন। বললেন—আপনাদের পিঠে পিঠঝুলি দেখেই আমি আন্দাজ করেছিলুম আপনারা যুথ হোস্টেলে থাকবেন। কাল আপনাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। সুইডেনে এক বিশেষ প্রকারের রেস্তরাঁ আছে, সেইটি আপনাদের দেখাবো।

মিরেক বলে উঠল—কিন্তু আমরা যে কাল ভিসিংস্‌ দ্বীপে যাচ্ছি। দুপুরে তো এখানে থাকবো না।

বুড়ো বললেন—বেশ তাহলে কাল প্রাতর্ভোজনে আসুন। আমার পক্ষে একই কথা। আমার সারাদিনই অবসর। আমায় তো চাকরি করতে হয় না, আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।

ভদ্রলোকের পোশাক জুতো এবং হাব-ভাব দেখে ধনী বলে মোটেই মনে হয় না, বরং উল্টোটাই মনে হবার কথা। যাই হোক, আমাদের তাতে কি-ই বা এসে যায়? বিদেশে এসে এমন আতিথেয়তা এত হৃদ্যতা, সেইটাই আমাদের লভ্য। ভদ্রলোক বললেন সকাল সাতটার সময় এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যে রেস্তরাঁয় পরের দিন আমরা গেলুম সেটা সুইডেনের একটা বিশেষত্ব। এ ধরনের চমৎকার নিয়ম কোনো দেশের কোনো রেস্তরাঁয় এর আগে আমরা কখনো দেখি নি। একটা প্রকাণ্ড হল। হলের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন খাবারের টিকিট বিক্রী করছে। টিকিটের নির্দিষ্ট মূল্য মাথা-পিছু দু টাকা।

টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকে যাও—দেখবে একটা প্রকাণ্ড লম্বা টেবিল, তাতে অগুন্‌তি রকমের খাবার সাজানো। আমিষ, নিরামিষ, চর্ব, চোষ্য, "যত কিছু খাওয়া লেখে স্বইডিশ ভাষাতে" সব জড়ো করা হয়েছে। গরম খাবার, ঠাণ্ডা খাবার, যা খুশি, যত খুশি নিজের প্লেটে তোলো আর খাও, কেউ কিছু বলবে না। খেতে গিয়েছিলুম আমরা প্রাতর্ভোজন, হল আমাদের মহাভোজন। পেট ভরিয়ে যখন মিরেক আর আমি দুজনে দু পেয়ালা কফি নিয়ে চুমুক দিচ্ছি, দেখি এস্‌পেরান্টো-বুড়ো কোথায় সরে গেছেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি যে-টেবিলে পাঁউরুটি, মাখন, পনির, হ্যাম্ প্রভৃতির স্তূপ, সেইখানে দাঁড়িয়ে নিপুণ হস্তে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছেন। স্যাণ্ডউইচ তো নয়—স্যাণ্ডউইচের পাহাড়। সেই অত স্যাণ্ডউইচ বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দুজনের পিঠঝুলিতে ভরতে লাগলেন।

আমরা বাধা দিয়ে বললুম—এ কি করছেন? দু টাকার বদলে অন্তত চার টাকার খাবার খেয়েছি প্রত্যেকে। আবার ছাঁদা বাঁধছি দেখলে এরা মেরে তাড়াবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—এখানকার নিয়মই এই। দেখুন প্রায় প্রত্যেকেই স্যাণ্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে কিছু না নিয়ে গেলে এরাই বরং ক্ষুণ্ন হয়, মনে করে এদের খাবার খেয়ে আপনারা তৃপ্ত হন নি।

এরকম আশ্চর্য প্রথা আমরা এর পূর্বে কোথাও দেখি নি, কল্পনাও করতে পারি না। যাই হোক পিঠঝুলিতে খাদ্য বোঝাই করে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম পথে। একটা চৌমাথার মোড়ে এসে প্রথমে খুঁজে বার করলুম গ্রানা গ্রাম কোন পথে কয় কিলোমিটার দূরে। এ-সব দেশে রাস্তার মোড়ে লোহার খুঁটির গায়ে ফলক লাগিয়ে এই ধরনের নির্দেশ সর্বত্র দেওয়া থাকে। বোঝবার কোনো কষ্ট হয় না। কাজেই শুরু করলুম আমরা গ্রানার দিকে হাঁটতে।

আধ ঘণ্টাটাক হেঁটেছি। শহর প্রায় পার হয়ে এলুম। এর আগে কোনো মোটার থামাবার চেষ্টা করি নি; কারণ, শুনেছিলুম শহরের মধ্যে লাফা-যাত্রীরা

গাড়ি থামায় না। গাড়ি বিশেষ থামতেও চায় না। তা ছাড়া যদিও বা কেউ থামে, হয়তো দেখা যাবে শহরের মধ্যেই গাড়িটা কোথাও যাচ্ছে। কাজেই কোনো দিক দিয়েই লাভ হয় না। শহরতলীর দৃশ্য চোখে পড়ল ক্রমে। আর ঘেঁষাঘেঁষি দালান নেই। দূরে দূরে বাড়ি, বড় বড় জমি আর তার পিছনে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এক ঝাঁক পাখির শব্দ কানে এল গাছের পাতার আড়াল থেকে।

সেই সময় দেখি পিছন থেকে একটা গাড়ি আসছে। দেখলুম সামনের সীট-এ দুজন বসে, তার মধ্যে একজনের মাথায় ড্রাইভারের টুপি। পিছনের সীটটা খালি। লাফা-যাত্রা করার উপযুক্ত গাড়ি। আমরা দুজনেই হাত তুললুম। ড্রাইভার একটা সেলাম করে গাড়িখানা থামালো। সেলাম করা দেখে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম—আমাদের আবার সেলাম করে কেন? আমরা কি গাড়ির মালিক? আমরা তো প্রার্থী। তবে? হবেও-বা সুইডিশ ভদ্রতাই এই রকম—যাকে কৃতার্থ করছে তার কাছেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। এই সব ভাবতে ভাবতে মোটার গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম। সেলাম করার ফলেই বোধ হয় বলতে ভুলে গেলুম আমরা কোথায় যেতে চাই। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি সুইডিশ ভাষায় দু-তিনবার প্রশ্ন করায় আমাদের চৈতন্য হল। আমরা তখন লজ্জিত হয়ে বললুম—গ্রানা গ্রানা গ্রানা।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে কি বলতে লাগলেন। সবটা না বুঝলেও এটা বুঝলুম যে গাড়ি গ্রানায় যাবে না। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় এই ভেবে আমরা যেই গাড়ি থেকে নামতে যাবো অমনি ড্রাইভার সাহেব কি একটা বলে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। আমাদের আর নামা হল না।

আমি মিরেককে বললুম—ব্যাপারটা কি হল? আমরা কি বন্দী হলুম?

মিরেক বললে—আশ্চর্য কিছু নয়। ভাষা না জানলে অসুবিধে অনেক।

আমি বললুম—মিরেক, তুমি অসুবিধের কথা বলছ। আমি কিন্তু

ইয়োরোপে এসে দেখেছি ভাষা না জানার সুবিধে কত। কেন জানি না, এরা এই ইয়োরোপের মানুষগুলো অসহায় লোক দেখলেই তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। ঠিক আমাদের দেশের উল্টো।

মিরেক বললে—তোমার নিজের দেশ সম্বন্ধে যেগুলো বলো তার কতটা ঠাট্টা আর কতটা সত্যি আমার পক্ষে বোঝা শক্ত।

আমি বললুম—বিশ্বাস করো, কলকাতা শহরে যদি একজন ইটালিয়ান ঘুরে বেড়ায়, যে ইটালিয়ান ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না, তাকে শুধু ঘুরেই বেড়াতে হবে। কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। অথচ এখানে যেই লোকে বুঝতে পারে আমি তাদের দেশে এসেছি অথচ তাদের ভাষা জানি নে, অমনি আর রক্ষে নেই—হোটেল খুঁজে দাও, মিউজিয়াম দেখাও, দোকানে নিয়ে যাও, কফি, কেক খাওয়াও, আদরের আর ইয়ত্তা নেই। ইংরিজীটা জানি বলে ইংলণ্ডে ঐ জন্মে আমরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারি না।

বলতে বলতে য়োনশোপিং ছাড়িয়ে হুস্ক্‌ভার্নাতে এসে আমাদের গাড়ি পৌছল। সেখানে পৌছেই ভীষণ শব্দে হর্ন দিতে দিতে আমাদের গাড়িখানা আরেকটা চলন্ত মোটারের পিছনে তাড়া করে প্রায় তাকে ধাক্কা মেরে শেষে হাত দেখিয়ে থামাল। আমরা যখন ভাবছি, এ আবার কি ব্যাপার, দেখি আমাদের ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম আমাদের নামতে বলছে। কিন্তু আবার সেলাম কেন রে বাবা! আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। ততক্ষণে দেখি অন্য গাড়ির দরজা খুলে গেছে। বুঝলুম, এইবার আমাদের ঐ গাড়িতে উঠতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হল যেন বায়োস্কোপের পর্দায় ঘটছে। আমরা গাড়ির মধ্যে উঠে বসতে না বসতেই প্রথম গাড়িটা ধোঁয়া ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

তখন আমরা এই গাড়ির চালকটিকে লক্ষ্য করলুম। দেখলুম, একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—তাঁর মাথার সিঁথিটা দেখবার মতো। আমাদের সিঁথি আমরা যত যত্নেই কাটি, ঠিক ব্রহ্মতালুর কাছে এসেই সেটা শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের সিঁথি অতি পরিপাটিভাবে একেবারে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পিছনে বসে তাই দেখতে লাগলুম এবং আমাদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে লাগল। এ রকম আশ্চর্য সিঁথি মিরেককেও স্বীকার করতে হল, আমাকেও স্বীকার করতে হল, আমরা কোথাও দেখি নি।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর আমরা গোড়ায় জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরেজীতে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম, তিনি 'গ্রানার' পথে যাচ্ছেন কি না। ভদ্রলোক দেখলুম কিছু ইংরেজী জানেন। বললেন, গ্রানার অর্ধেকটা পথ আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন।

মিরেক তখন সিঁথিওয়ালা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে, যাঁরা এই মাত্র আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন তাদের কি তিনি চেনেন?

ভদ্রলোক বললেন—ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে চিনি—আমাদেরই এই শহরের ট্যাক্সি তো। কিন্তু অন্য যাত্রীটিকে চিনি না।

—কি সর্বনাশ! ট্যাক্সি! বলে মিরেক আমি দুজনেই চমকে উঠলুম। আমরা বললুম—কই? তাহলে ভাড়া তো নিল না, গেল কোথায় লোকটা?

সিঁথিওয়ালা ভদ্রলোক বললেন—বাঃ রে, আপনারা লাফা-যাত্রা করছিলেন না?

আমরা বললুম—তাই বলে ট্যাক্সিতে? প্রাইভেট গাড়িতে চড়ি, লরিতে চড়ি সে কথা আলাদা। ট্যাক্সি করে লাফা-যাত্রা হয় নাকি?

ভদ্রলোক বললেন—কেন হবে না? এই তো হল দেখলেন। সুইডেনে সব হয়। ট্যাক্সিওয়ালা উল্টো পথে এতদূর এসে আমার গাড়িতে আপনাদের চড়িয়ে দিয়ে গেল, চোখের সামনেই তো দেখলেন। এই বলে তিনি তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

এতক্ষণে আমাদের কাছে গাড়ির ড্রাইভারের সেলাম করার রহস্যটা পরিষ্কার হল। বুঝলুম ট্যাক্সি ড্রাইভারের খদ্দেরকে সেলাম করা অভ্যেস বলে সে কৃপার্থীকেও সেলাম করতে কসুর করে নি।

চললুম আমরা হুস্ক্‌ভার্না ছাড়িয়ে গ্রানার পথে। ভদ্রলোক একহাতে স্টিয়ারিং ধরে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চললেন। বেশীদূর আমাদের যেতে হল না। একটা ফাঁকা জায়গায় এক তেমাথার মোড়ে তিনি গাড়ি দাঁড় করালেন। আমরা নেমে যেতে তিনি বিদায় নিয়ে গ্রানার পথ ছেড়ে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে নিলেন তাঁর গাড়ি। তারপর তাঁর সেই ঘাড় অবধি অদ্ভুত সিঁথি যতক্ষণ দেখা যায় আমরা তার দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর তা-ও মিলিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি এদিকে বিরল। দু'এক খানা যা গেল তা হয় যাত্রীতে ভর্তি, আর নয় হাত দেখালেও থামলো না। হঠাৎ দেখি একটা কাঠ বোঝাই লরি আসছে। পিঠঝুলি পিঠে আমাদের দুজনকে রাস্তার ধারে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লরির গতি কমে এল। আমরাও সুযোগ বুঝে হাত তুললুম। লরিটা থামতে দেখি অতি অমায়িক দুটি ছেলে, একজন তার মধ্যে লরিচালক। কিন্তু তাদের পাশে বসে আর একজন ও কে? এ যে দেখি আমাদের যুথ হস্টেলের সেই ডেনিশ কবি!

আমরা লরির পিছনে কাঠের বোঝার উপর উঠতে উঠতে কবিকে বললুম—কোথায়, কতদূরে যাওয়া হচ্ছে?

—কোথায় আবার? গ্রানা দ্বীপে, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন।

—বাঃ, তা জানলে তো একসঙ্গেই বেরতে পারতুম। আমাদের আগে বললেন না কেন?

—শুনুন তবে বলি। কাল শুনলুম আপনারা লাফা-যাত্রা করে গ্রানা যাবেন স্থির করেছেন। মনে করলুম আপনারা নতুন যাত্রী, নবীন উৎসাহ, তড়বড় করে চলবেন। হয়তো ভোর না হতেই রওনা দেবেন।

আমি কুঁড়ে মানুষ আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন?—তাই কিছু বলি নি।

আমরা বললুম—আপনি বুঝি কুঁড়ে মানুষ? কুঁড়ে হলে কি আর বাড়ি-ঘর ছেড়ে বেরতেন দুনিয়া দেখতে?

কবি বললেন—লাফা-যাত্রার আসল রসটাই তাহলে দেখছি আপনারা ধরতে পারেন নি। যারা তড়িঘড়ি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে চায়, লাফা-যাত্রা তাদের জন্যে নয়। কুঁড়ে লোক, যার কোনো সময়ের দাম নেই তারাই এর রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে। আমি হচ্ছি ঐ দলে।

আমরা বললুম—এইবার একটু বোধগম্য হচ্ছে।

—আজকের লাফা-যাত্রাটাই দেখুন না। আপনারা আমার কত আগে বেরিয়েছেন। যে গাড়ি আগে পেয়েছেন তাতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছেন। অথচ দেখুন এগিয়ে গিয়ে আপনাদের কিছুই লাভ হয় নি। লাফা-যাত্রার সূত্র অনুসারে যে পিছিয়ে থাকে তারই লাভ বেশি। কারণ গাড়িগুলো তো সামনের দিক থেকে আসে না; আসে পিছন থেকে। পিছনের লোকই সেইজন্যে সুযোগ পায় সব চেয়ে বেশি। এই দেখুন না, আজ তিনখানা গাড়ি থামিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়ে এই চতুর্থ গাড়িটাকে পছন্দ করেছি। যখন শুনলুম এইটে সোজা গ্রানায় যাচ্ছে তখন এটাতেই চেপে বসলুম। আপনাদের হারিয়ে দিতে আমার কিছু বেগ পেতে হল না।

আমরা বললুম—লাফা-যাত্রার সূত্রটা এতক্ষণে আমাদের মাথায় ঢুকলো।

আমাদের লরি গ্রানায় এসে পৌঁছল। ছোট্ট একখানি গ্রাম, ছবির মতো সুন্দর তকতকে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের ছায়ায় ঢাকা একখানি রাস্তার ধারে আমাদের নামিয়ে দিয়ে লরিটা চলে গেল। ছায়াস্বপ্ন-ময় এই রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে ক্রমে জলের ধার পর্যন্ত গিয়েছে। খোলা লরিতে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে শরীর-মাথা যেমন গরম হয়ে গিয়েছিল, গ্রানার এই সুশ্যামল বীথিতে নেমেই

মন প্রাণ দেহ শীতল হয়ে গেল। হ্রদের ধারে পৌঁছেই একটা নৌকো পেয়ে গেলুম এবং ওপারে ভিসিংস্ দ্বীপে পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল।

সকলেরই খিদে পেয়ে গিয়েছিল। সকলেই প্রায় একসঙ্গে প্রস্তাব করলুম —প্রথমে খাওয়া, তারপর অন্য কাজ। ঘাসে ঢাকা দ্বীপের এক অংশ বেছে নিয়ে আমরা তিন জনে বসে পড়লুম এবং যে যার পিঠঝুলি খুললুম স্যাণ্ডুইচ বার করবার জন্যে। মিরেক আর আমি পিঠঝুলি থেকে আজ সকালের প্রাত-র্ভোজনের উথলে-পড়া ভোজ্যাংশ প্রচুর বার করলুম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কবির পিঠঝুলি থেকে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না। তিনি সেই কাগজগুলি বেশ পরিপাটি করে ঘাসের উপর বিছিয়ে আমাদের স্যাণ্ডুইচের জন্যে বসে রইলেন; বললেন—আপনারা যা তাড়াতাড়ি করে দ্বীপে চলে এলেন, গ্রামে গিয়ে একটু রুটি-মাখন কিনব তারও সময় পেলুম না।

অগত্যা আমাদের স্যাণ্ডুইচের পাহাড় তিন ভাগে ভাগ হল এবং সেই পর্বত শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগল না। দ্বীপে আমরা খানিকটা বেড়ালুম। পুরাকালের দ্বীপাধিকারীর প্রাসাদ দেখলুম। তারপর সে-দিনের অভিযান শেষ করে ফিরতি পথে চললুম বাড়িমুখো।

গ্রানা গ্রামের মোটার-গামী পথে দাঁড়িয়ে আমাদের ঠিক হল, তিন জন একসঙ্গে যাওয়া চলবে না। তাতে হয়তো অনেক গাড়িই থামবে না। কাজেই আমি আর মিরেক একত্র এবং কবি একলা, এইভাবে যাওয়া যাক।

কবি বললেন—আপনারা তাহলে এগিয়ে যান। আমি না হয় পরেই যাচ্ছি।

মিরেক বললে—আরে তা কি হয়? আপনি হলেন মাননীয় অতিথি, আপনি এগোবেন তবে না আমরা আপনার পিছু পিছু যেতে পারব।

কবি বললেন—বটে? আমার কাছে বিদ্যে শিখে এখন আমারই উপর ফলানো হচ্ছে? কিন্তু য়োনশোপিং-এর পথে প্রথম যে গাড়িটা আসবে সেটার মাত্র একটা সীট খালি থাকবে। কাজেই আপনাদের না নিয়ে সেটা আমাকেই নিয়ে যাবে দেখবেন।

এই ভবিষ্যৎ বাণী করে কবি এগোলেন। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইলুম। রাস্তার উপর স্যাণ্ডেল ঘষতে ঘষতে আমাদের কবি চোখের আড়ালে সবেমাত্র অদৃশ্য হয়েছেন এমন সময় আকাশ থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। হ্রদের দিক থেকে একখানা গ্রীষ্মের মেঘ অলক্ষ্যে উঠছিল, সেটাই এবার সূর্যকে আড়াল করে ফেললে। আমরা পিঠঝুলি খুলে বর্ষাতি বার করবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় দেখি একখানা গাড়ি আসছে। গাড়িটাকে থামালুম। একজন ভদ্রলোক আর মহিলা সামনে বসে। গাড়ির পিছনটা খালি। জিজ্ঞেস করে জানলুম তাঁরা এই গ্রানা গ্রামেরই প্রান্তে একটি হোটেল পর্যন্ত যাচ্ছেন। ততক্ষণে বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে গেছে। আমি বললুম—মিরেক, ওঠো। যতটুকু যাওয়া যায়, নইলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে।

কিন্তু মিরেক পিছিয়ে এল। বললে—না, এ গাড়ি নিলে আমরা ঠকে যাবো। বেশি দূর তো যাওয়া যাবে না, কবিকে ছাড়িয়ে কিছুটা যাবো মাত্র। তাতে কবিরই সুবিধে হবে। পিছন থেকে একখানা দূরগামী গাড়ি আমাদের আগেই সে ধরবে ; ধরে হয়তো এক লাফেই য়োনশোপিং! এই বলে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িটাকে সে ছেড়ে দিলে। আমরা তখন একটা বাড়ির আলসের নিচে গিয়ে বর্ষাতি বার করে পরলুম।

অনেকক্ষণ পরে আর একটা গাড়ি এল। আমরা হাত দেখাবার আগেই গাড়িটা থামল। অতি অমায়িক এক ভদ্রলোক। বর্ষাতি পরা লাফ্কা-যাত্রী দেখেই চিনেছিলেন। বললেন, য়োনশোপিংএর ঠিক আগের গ্রাম পর্যন্ত তিনি যাচ্ছেন, তাতে যদি আমাদের কিছু সুবিধে হয়।

আমরা বললুম—নিশ্চয় হবে। ওখান থেকে তো সামান্য দূর। তা ছাড়া ট্রামই রয়েছে। বলে, আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। গাড়ি চলতেই মিরেক আর আমি রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখলুম, কবিকে কোথাও দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোথাও তার টিকিটি দেখতে পেলুম না। কি আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? ঐ একটিই তো রাস্তা—অন্তত পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে কোনো তে-মাথা নেই যে অন্য দিক থেকে আগত কোনো গাড়ি সে ধরতে পারে।

এইটুকু সময়ের মধ্যে এতটা পথ তার পক্ষে হাঁটাও সম্ভব নয়। তবে লোকটা কি উবে গেল?

মিরেক বললে—নিশ্চয় বৃষ্টি দেখে কারুর বাড়িতে গিয়ে ঢুকে জমিয়ে বসেছে। হয়তো সেখানে এখন সোফায় বসে চা-কেক খাচ্ছে।

অমায়িক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে যখন তাঁর গ্রামের কাছে পৌছলেন তখন বৃষ্টি কমে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ থামে নি। তিনি বললেন—চলুন আপনাদের য়োনশোপিং পর্যন্ত পৌছেই দিয়ে আসি। আমারও তাহলে ডাকঘরটা ঘুরে আসা হয়। দেখব চিঠি-টিঠি এসেছে কি না। এই বলে আমাদের য়ুথ হস্টেলের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

য়ুথ হস্টেলে পৌছে দেখি, অনেক আগেই কবি এসে গেছেন। কি ব্যাপার, জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন—বৃষ্টি দেখে তিনি এক পেট্রোল স্টেশানে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে পেট্রোলওয়ালা তার কাঁচের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। তার সঙ্গে বসে চা-কেক খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে হঠাৎ একটা গাড়ি তেল নিতে এল। য়োনশোপিং থেকেই এল গাড়িটা, সেইদিকেই ফিরে যাবে। কাজেই কবির মিলে গেল সুযোগ।

এইভাবে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে মিরেক আর আমি পরামর্শ করতে বসলুম, স্টকহলমে পৌছে সেখান থেকে কি উপায়ে নরওয়ে যাওয়া যায়। লাফা-যাত্রার আমোদটা দুজনকেই আমাদের পেয়ে বসেছিল। এই একদিনের লাফা-যাত্রায় কতরকম মজার লোকের সঙ্গেই না পরিচয় হল। ট্রেনের কামরায় বসে বা দূরগামী বাস-এর সীটে বসে কি আর এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে? এক জায়গায় বসে বসে শুধু পা টনটন করবে, চোখ টনটন করবে! সুতরাং ঠিক হল 'জয় বিশ্বনাথ' বলে বেরিয়ে পড়ব স্টকহল্‌ম থেকে রাস্তার উপর। তারপর আমাদের হাত উঠবে আর নামবে। দেখি কতদিনে কতগুলো গাড়ি থামিয়ে নরওয়েতে পৌছতে পারি।

এইভাবে মনস্থির করে নিয়ে পরের দিন ভ্যাটার্ন হ্রদের উপকূলে গিয়ে স্টীমারে উঠলুম। এস্‌পেরান্টো-বুড়ো আমাদের বিদায় জানাতে ঘাটে এসেছিলেন। স্টীমার ছাড়বার ঠিক আগে তাঁর ব্যাগ থেকে বার করে দুটি উপহার আমাদের হাতে গুঁজে দিলেন—একটি মানিব্যাগ আর একটি টুপি। অদ্ভুত এই উপহার দুটি গ্রহণ করে আমরা হাত নেড়ে প্রচুর ধন্যবাদ জানালুম। স্টীমার ছেড়ে দিল। তখন উপহার দুটিকে আমরা ভাল করে লক্ষ্য করলুম। দেখলুম, দুটিই বহুদিনের পুরোনো ব্যবহার করা জিনিস।

আমি মিরেককে বললুম—মিরেক, এই বুড়োকে আজ অবধি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

মিরেক বললে—আমিও না। চল জাহাজের পিছনে যাতে কারো চোখে না পড়ে, এই স্মৃতিচিহ্ন দুটিকে ভ্যাটার্ন-এর জলেই বিসর্জন দেওয়া যাক।

য়োনশোপিং ছাড়িয়ে চললো আমাদের স্টীমার ভ্যাটার্ন হ্রদের কূলে কূলে। চারিদিকের স্থির নীল জল, ঢেউ নেই, হাওয়া নেই। রোদের আলোয় জল হাসছে, জলের ধারে মাটি হাসছে, মাটির উপর ঘাস হাসছে, সব কিছুই আজ এমনি আনন্দে ডগমগ। দক্ষিণ দিকে যে উপকূল দেখা যায়, তাই হচ্ছে লেগারলফ্‌ বর্ণিত স্মোলাণ্ডের সুজলা সুফলা অংশ। ডান দিকের উপকূল হচ্ছে পুর্ব-গটল্যাণ্ড। ডানদিকের তীর ঘেঁষে যেতে যেতে গটল্যাণ্ডের শ্যামল ভূমি চোখে পড়ল। সবুজে ঢাকা মাঠ আর ক্ষেত গড়িয়ে গড়িয়ে জলের মধ্যে এসে পড়েছে। তৃণভূমির সে কী রং! এমন নরম সবুজ বর্ণ বাংলা দেশে হয় না। এ হল শীতের দেশের গ্রীষ্মের রং। আমার চোখে কেমন অস্বাভাবিক লাগে—মনে হয় যেন মানুষে তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। এই সবুজ মাঠের উপর গরু চরছে, তাদের কিছু শাদা, কিছু খয়েরি। সব মিলে থেকে থেকে মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি—কিছুই সত্যি নয়।

বিকেলের দিকে ভ্যাটার্ন হ্রদ শেষ করে তার পুর্ব উপকূলস্থিত 'মোটালা' গ্রামের ঠিক পাশ দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লুম সরু খালের মধ্যে। স্টীমার চললো খালের পাশ ঘেঁষে। দুপারের গাছ-পালা বাড়ি-ঘর মনে হয় হাত

বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। ধীর গতিতে জল কেটে কেটে চলে স্টীমার। খোলা ডেকে হেলানো চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলবে সমস্ত সুইডেনের অলি-গলির মধ্যে আঁতি-পাতি করে। আলস্যে যতই দেহ মন আর চোখ ভরে আসে, দুপাশের দৃশ্য ততই আরো মনোরম আরো চমৎকার হয়ে ফুটে ওঠে। দুপাশেই ছোট ছোট গ্রাম, সুইডিশ চাষীদের সুদৃশ্য বাড়ি, ছাদগুলি ঢালু, তার পাশে একটু করে বাগান। চাষীদের ক্ষেত-খামার, পোশাক পরিচ্ছদ আর স্বাস্থ্যপুর্ণ চেহারা দেখে মনে হয় না যে কেউ গরিব। সবাই হাসিখুসী প্রাণবন্ত। আমাদের স্টীমারকে রুমাল নেড়ে অভিবাদন করতে কেউ ভুলছে না। খাল চলেছে খাস পল্লীগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে। এদিকে আর বড় শহর কিছু পড়ছে না। বহুকাল আগে যে সব পরাক্রমশালী জমিদার আর রাজন্যবর্গ দেশকে শাসন করতেন, তাঁদের পুরাকালের প্রাসাদ এবং বাগান-বাড়ি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, কিন্তু সেখানে কোনো জমিদার-বড়লোক আর নেই। সুইডেনে গরিব লোক যেমন নেই, তেমনি বড়লোকও নেই। চাষীই হোক আর মুচীই হোক, কেরানীই হোক আর ব্যবসায়ীই হোক সকলেরই বেশ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা। এদিক দিয়ে ছোট্ট দেশ সুইডেন অনেক বড় বড় দেশকে হার মানিয়েছে।

আমাদের স্টীমার একটা 'লক্'-এ এসে পৌছল। গ্যোটা খালের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত যেমন বহু হ্রদ তেমনি এইরকম বহু 'লক্'। গ্যোটা খালের পুর্ব পশ্চিম দুই মুখই সমুদ্রের উপর। এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ হচ্ছে যে কোনো দেশের সর্বনিম্ন স্থান। কাজেই খালের মাঝখানে যে সব হ্রদ তাদের জল দুমুখের জলের চেয়ে উঁচু। গ্যোটা খালের উচ্চতম অংশটা বোধহয় সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে দুশো ফিট উঁচু হবে। গ্যোটেবুর্গ শহর থেকে খালের আরম্ভ। সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল পথ গ্যোটা নদীর স্রোত উজিয়ে ভেনার হ্রদ। ভেনার হ্রদ থেকে খালের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত উঠতে হয় প্রায় দেড়শ ফুটের মতো। তারপর নামতে নামতে ভ্যাটার্ন হ্রদ—যেখানে

আমরা স্টীমারে উঠলুম। এখান থেকে আবার উঁচু এবং তারপর ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে গিয়ে শেষে বলটিক সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এই খাল। জলপৃষ্ঠের এই উচ্চতা আর নিম্নতা লাভ করবার উপায় হচ্ছে এই 'লক্'গুলি। সারা খালে প্রায় ষাট-সত্তরটা লক্ আছে, তার বেশির ভাগই খালের পশ্চিমাংশে। লক্-এর তুপাশে তুটি ফটক। ফটক যখন বন্ধ থাকে তখন ফটকের মধ্যেকার জল বাইরের জলের চেয়ে হয় উঁচু নয় নীচু। ফটক খুলে দিলেই ভিতরের জল আর বাইরের জলের উচ্চতা এক হয়ে যায়। জলের এই সহজ স্বাভাবিক গুণকে কাজে লাগিয়ে মানুষ লম্বা লম্বা অসমতল খালের মধ্যে দিয়ে স্টীমার নৌকো চলাচল করায়।

আমাদের স্টীমার যেই 'লক্'-এর ফটকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছনে একটা ফটক তুলে দেওয়া হল। পিছনের ফটক ভাল করে বন্ধ করতেই আমাদের সামনে যে ফটক, যার কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম সেটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। তার সামনে ছিল উঁচু জল—সেই জল এসে মিশল আমাদের জলে। আমাদের জল ক্রমে ক্রমে হতে লাগল উঁচু। পিছনে ফটক পড়ে গেছে—সে জলের আর বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের স্টীমার বেশ কয়েক ফিট উঁচুতে উঠে পড়ল। পিছনে দেখলুম পড়ে রয়েছে গোটা খালের নিম্ন জলাংশ। এইভাবে একটার পর একটা লক্ পার হয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম।

বিকেলের আলো সোনালী হয়ে মাঠ ঘাট উপবন, গ্রামের বাড়ির দেওয়ালগুলি, গাছের চুড়োগুলি সব সোনার পাতে মুড়ে দেয়। তারপর এক সময় দেখি সূর্য নেই কিন্তু আকাশে প্রচুর আলো রয়েছে। এদেশের এই মজার সন্ধ্যা। গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যার আলো রয়ে রয়ে আকাশের গায়ে লেগে থাকে। সব সময় মনে হয়, এইবার অন্ধকার নামবে, কিন্তু অন্ধকার নামতে চায় না। সন্ধ্যার খাওয়া-দাওয়া সব হয়ে যায়, খোলা ডেকে গোধূলির আলোতে গান-বাজনা চলতে থাকে। অনেকে তাদের রং-বাহার গ্রাম্য

পোশাক বার করে চাষীদের নাচ নেচে নেচে সবাইকে দেখাতে থাকে। মন হাল্কা হয়ে ওঠে। ছুটির সুর এসে লাগে সকলের প্রাণে। যাত্রীতে যাত্রীতে চেনা পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। তারপর কখন একসময়ে অন্ধকার নেমে আসে খালের উপর। স্টীমারের সামনের সার্চলাইটটা জ্বলে উঠতে সকলের নজর সেই দিকে যায়। ডেকের গানবাজনা বন্ধ করে তখন সকলে আর একবার স্টীমারের বাইরের জগতে নজর দেয়। সেখানে দেখা যায় অন্ধকারের লেপ মুড়ি দিয়ে সারি সারি গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-একটি রাত-জাগা প্রাণী যারা বাইরে ছিল তারাও মোটরে করে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরায় ব্যস্ত। স্টীমারের যাত্রীদের এতক্ষণে ঘুমের কথা মনে পড়ে। মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা ভেঙে যায়। সকলে সকলের কাছ থেকে রাত্রের মতো বিদায় নিতে শুরু করে। ডেক খালি হয়ে আসে।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, তাই তো, হিলারিকে এই গ্যোটা খাল থেকে একখানা চিঠি দেবার কথা ছিল। তাড়াতাড়ি একখানা গ্যোটা খালের ছবি-দেওয়া পোস্ট কার্ড কিনে হিলারিকে চিঠি লিখতে বসে গেলুম। চিঠিটা শেষ করে মিরেক আর আমি যখন ঘুমতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক তখনই জাহাজের কাপ্তেন এসে আমাদের পাশে বসলেন। যে রকম ভাবে বসলেন, মনে হল ভাল করে ভাব না জমিয়ে উঠবেন না। প্রথমেই বললেন—কেমন লাগছে আপনাদের এই খাল?

—অপূর্ব।

—বলুন আপনাদের কি খেতে দেব? মদ খাবেন?

—মদ আমরা খাই না। বরং কমলালেবুর রস আনতে বলুন।

কাপ্তেন তখন প্রকাণ্ড এক জগ ঠাণ্ডা কমলালেবুর শরবত আর চকচকে তিনখানা গ্লাস আনিয়ে বসলেন আমাদের সঙ্গে। ডেকের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আলো নেভাতেই আমরা টের পেলুম আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কখন যে চাঁদ উঠে এমন মায়াজাল বুনে গেছে কেউই আমরা জানতে পারি নি।

জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে কাপ্তেন বললেন—গ্যোটা খাল কে বানিয়েছে জানেন ?

আমরা দুজনেই বললুম—জানি না তো !

কাপ্তেন তেমনি উদাস ভাবে বললেন—শুনতে পাই গ্যোটা খাল বানিয়েছে সুইডেনের সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার টমাস টেলফোর্ড। মেপে-জুপে, এটা গড়ে, ওটা ভেঙে, এটা জুড়ে, ওটা খুলে বাইশ বছর লেগেছিল এই খাল সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

আমরা ভারি অবাক হয়ে বললুম—সে কি ?

কাপ্তেন বললেন—ছেলেবেলায় আমরা আমাদের ঠাকুর্দার কাছ থেকে গ্যোটা খাল সৃষ্টির যে অপুর্ব গল্প শুনেছি তা যেমনি চমকপ্রদ তেমনি মনো-রঞ্জক। আমি ঠাকুর্দার গল্পটাই বিশ্বাস করি। ইঞ্জিনিয়ার টেলফোর্ড-এর গল্প আমার মনে হয় ভুয়ো।

আমরা বলে উঠলুম—কি রকম, শুনি শুনি।

কাপ্তেন বললেন—আপনারা বিশ্বাস হয়তো না-ও করতে পারেন। কিন্তু ছেলেবেলায় আমার তিন দাদা আর দুই বোন আমরা সকলেই বিশ্বাস করতুম; আমি নিজে এখনও মনে করি এই খাল সৃষ্টি করেছেন 'হিসিঙ্গেন'-এর রাজপুত্র।

আমরা বললুম—বলুন না গল্পখানা শুনি।

কাপ্তেন তখন কমলালেবুর রসে আর একবার আমাদের গ্লাস ভরে দিলেন। গল্প শুরু হল।

কাপ্তেন বললেন—আমাদের দেশ হলো 'মোটালা' গ্রামেরই ঠিক পাশে। আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে গ্যোটা খাল বয়ে গেছে। ঠাকুর্দা ছেলে-বেলা থেকে ঐ গ্রামে মানুষ, কাজেই গ্যোটা খালের সত্য ইতিহাস

তিনি যদি না জানেন তো আর কে জানবে? ঠাকুর্দা বলতেন, 'হিসিঙ্গেন' দ্বীপে বহুকাল আগে এক রাজপুত্র থাকতেন। হিসিঙ্গেন কোথায় জানেন তো? ভেনার হ্রদ থেকে গ্যোটা নদী বেরিয়ে এসে যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে নদীর দুই বাহুর মাঝখানে পড়ে একটি ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড একটি ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। ম্যাপ খুললেই দেখতে পাবেন, এই হচ্ছে হিসিঙ্গেন। এই হিসিঙ্গেন ব-দ্বীপের পুব কোণে হচ্ছে এখনকার গ্যোটেবুর্গ বন্দর। তখনকার দিনে গ্যোটেবুর্গ ছিল কি না, অথবা তার কি নাম ছিল জানা নেই। কিন্তু হিসিঙ্গেন দ্বীপ ছিল তখনকার দিনে অতি উর্বর দ্বীপ। সেখানকার মাটিতে সোনা ফলত। হিসিঙ্গেন দ্বীপে যা গম হত, যা ফসল হত, যা ফল হত, যা তরকারি হত, যা দুধ হত, যা মাখন হত, যা পনির হত, যা ডিম হত, হিসিঙ্গেন দ্বীপের জেলেরা যা মাছ ধরত, তা হিসিঙ্গেনের মতো দশখানা দ্বীপের লোক খেয়ে শেষ করতে পারত না। কাজেই হিসিঙ্গেন-রাজ এই সব বাড়তি ফসল বাড়তি খাদ্যদ্রব্য দ্বীপের বাইরে বিক্রী করতেন আর তার বদলে কিনতেন দেশের লোকের জন্যে ভাল ভাল কাপড়-চোপড়, জুতো, গৃহস্থালীর জিনিস, আর নানারকম দ্রব্য, যা হিসিঙ্গেন দ্বীপে হয় না। সে রাজ্যে কোনো অভাব ছিল না, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত।

হিসিঙ্গেন রাজপুত্রের ছিল সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার শখ। তিনি ছিলেন যেমন সুন্দর সুপুরুষ, তেমনি ছিলেন শক্তিমান। আর নৌচালনায় ছিলেন তিনি দক্ষ। তখনকার দিনে সুইডেনের পশ্চিম উপকূলের রাজাদের, রাজপুত্রদের সকলকেই নৌচালনা ভাল করে শিখতে হত। কারণ প্রথমত সমুদ্রের দিক থেকে প্রায়ই দেশ আক্রান্ত হত; দেশরক্ষা করতে গেলে জলযুদ্ধ ভাল করে জানা চাই। আর দ্বিতীয়ত তখনকার রাজবংশ বিয়ে করতেন এমন কন্যাকে যার দেশ সাগর-কূলে। সমুদ্রের উপরে এমন তাদের টান ছিল যে, সাগরকূলের কন্যা না হলে তাদের বিয়েই হত না। আর বিয়ে করে কন্যাকে ঘরে আনতেন তাঁরা নিজেদের নৌকোয় করে। সাজানো নৌকো নিজে চালিয়ে —এই ছিল রীতি।

হিসিঙ্গেন-রাজপুত্র একবার সমুদ্রে গিয়েছিলেন বেড়াতে তাঁর নিজের নৌকোয়। সঙ্গে ছিল কয়েকজন অনুচর। হঠাৎ উত্তর দিক থেকে উঠল এক ঝড়। নৌকো ছুটল ঝড়ের মুখে তীরের বেগে। কূল কোথায় পড়ে রইল তার ঠিক রইল না। দিকভ্রম হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত এমনি সমুদ্রের কোলে ভেসে ভেসে তারপর যখন ঝড় থামল, তখন রাজপুত্র আর অনুচরেরা দেখতে পেলেন আকাশের পথে ঝাঁকের পর ঝাঁক পাখি উড়ে চলেছে। এই পাখির ঝাঁক নিশ্চয় ডাঙার দিকে যাচ্ছে, এই ভেবে সেই পাখি-ওড়া পথ লক্ষ্য করে তাঁরা নৌকো বাইতে লাগলেন। সারাদিন নৌকো বেয়ে তাঁরা শেষে কূল পেলেন এবং যেখানে এসে পৌঁছলেন তার নাম হচ্ছে 'মেম্'। এ হচ্ছে সুইডেনের পূর্ব উপকূলে বল্টিক সমুদ্রের উপর। বল্টিকের জল এখানে 'ফিয়োর্ড'-এর আকার নিয়ে জমির মধ্যে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ঢুকে গিয়েছে। ফিয়োর্ড-এর শান্ত স্থির জলের উপর শান্ত স্থির এই গ্রাম 'মেম্'। রাজপুত্র তাঁর অনুচর নিয়ে এই গ্রামে এসে উঠলেন।

গ্রামের লোকেরা যখন শুনলো হিসিঙ্গেন দ্বীপের রাজপুত্র এসেছেন, তারা খাতির করে নিয়ে গেল তাঁকে গ্রামের জমিদারের বাড়ি। জমিদারবাড়িতে রাজপুত্র সমাদরে রইলেন। রাজপুত্রের নৌকোয় ঝড়ের ফলে যে ভাঙচোর হয়েছিল তা গ্রামে সারানো হতে থাকলো।

এই জমিদারের এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। রাজপুত্র তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রাজপুত্র জমিদারকে জানালেন তিনি তাঁর কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চান। জমিদার তো খুশীই হলেন। এমন জামাই তিনি পাবেন কোথায়? বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। ইতিমধ্যে রাজপুত্রের নৌকো সারানো হয়ে গেল। রাজপুত্র হুকুম দিলেন রেশমী কাপড় আর জরি দিয়ে নৌকো ভাল করে সাজাতে—তিনি বৌ নিয়ে নৌকো বেয়ে দেশে ফিরবেন। নৌকো সাজল, অনুচরেরাও সাজল। গ্রামের লোকেরা নৌকোয় ফুল ভরে দিল। তারপর গ্রামসুদ্ধ সবাই এসে জমিদারকন্যাকে রাজপুত্রের নৌকোয় তুলে দিলে। জমিদার জমিদারনী আর গ্রামের সকলে চোখের জল মুছে

তীরে দাঁড়িয়ে রইল—রাজপুত্র তাঁর বধূকে নিয়ে জলের পথে পাড়ি দিলেন। রাজপুত্র নিজে ধরে বসলেন হাল—যেমন হিসিঙ্গেন দেশের রীতি।

ফিয়োর্ড-এর শান্ত জল ছেড়ে নৌকো যখন খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়ল তখন আকাশ অন্ধকার করে এলো ঝড়। বড় বড় ঢেউ আর নৌকোর দুলুনি দেখে জমিদারের মেয়ে ভয়ে কান্না শুরু করলেন। রাজপুত্র তাকে যত বোঝান, যত বলেন—এই ঢেউ দেখে ভয় পাও, এর চেয়ে কত বড় বড় ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যে আমাদের নৌকো বেয়ে নিয়ে যেতে হয়। জমিদারকন্যা কিন্তু কিছুতেই শান্ত হন না। পাটাতনের উপর বসে তিনি অঝোরঝরে কাঁদেন আর বলেন তাঁর দেশে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। শেষে রাজপুত্র আর থাকতে পারলেন না, অনুচরদের বললেন, ফেরাও নৌকো মেম্-এর দিকে।

রেশমী কাপড়, জরী আর ফুল দিয়ে সাজানো নৌকোকে ফিরতে দেখে গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে ঘাটে ভিড় করে এলো। তারপর যখন সকলে ফেরবার কারণ শুনলো তারা বললে—হবেই তো, জমিদারের বড় ছেলে যে সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, জমিদারকন্যা মেম্-এ এসে আর নড়তে চাইলেন না। তিনি বললেন স্থলপথে ঘোড়ায় করে বা চতুর্দোলায় চেপে হিসিঙ্গেন চলো। কিন্তু রাজপুত্র রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তাঁদের বংশের কোনো রাজা বা রাজপুত্র ঘোড়ায় করে বৌ আনেন নি; তাঁরা সকলেই রাজবধূ এনেছেন নৌকোয় করে নিজের হাতে হাল ধরে। সুতরাং রাজপুত্রের নৌকো ঘাটে বাঁধা রইল। রাজপুত্র ঘোড়ায় করে স্থলপথে দেশে ফিরে গেলেন। বলে গেলেন, জমিদারকন্যার যদি কোনোদিন জলপথে তাঁর দেশে আসবার সাধ জাগে তবেই তিনি আসবেন বধূকে নিতে।

দেশে ফিরে এসে রাজপুত্রের মাথায় এক নতুন মতলব খেলে গেল। ঘোড়ায় করে তিনি যে পথ দিয়ে ফিরেছিলেন সে পথে তিনি দেখেছিলেন একটার পর একটা হ্রদ প্রায় সারা রাস্তা জুড়ে পড়ে রয়েছে। সুইডেন দেশে যে এত হ্রদ থাকতে পারে তা তিনি জানতেনই না। এই হ্রদগুলিকে যদি

খাল কেটে মালার মতো জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে হিসিঙ্গেন থেকে মেম্ পর্যন্ত একটানা একটা জলপথ সৃষ্টি করা যায়। এই মতলব মাথায় আসতেই রাজপুত্র কাজে লাগলেন। খাল কাটা শুরু হয়ে গেল।

বসন্তকালের আরম্ভে রাজপুত্র ঘোড়ায় করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। পরের বছর যখন পাহাড়ের বরফ গলতে আরম্ভ করেছে, নেড়া গাছের ডাল পাতার কুঁড়িতে ভরে আসছে আর মাঠের কোণে কোণে ফুটতে আরম্ভ করেছে বসন্তের প্রথম ফুল 'স্নো ড্রপ' ঠিক তখনই রাজপুত্র খাল কাটা শেষ করে মেম্-এ এসে পৌঁছলেন।

এবারে আর নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি যেতে জমিদার-কন্যার কোনো বাধা রইল না। ঘাটে-বাঁধা রাজপুত্রের নৌকো আবার নতুন-সাজে সাজল। সারা গ্রাম পতাকা দিয়ে সাজানো হল। জমিদার মস্ত ভোজ দিলেন। মনে হল যেন রাজপুত্র আর জমিদার-কন্যার আর একবার নতুন করে বিয়ে হচ্ছে। তারপর জমিদার-কন্যা রাজবধূর সাজে রাজপুত্রের হাত ধরে হাসিমুখে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন! রাজপুত্র নিজের কাটা খালের মধ্যে নৌকা চালিয়ে বৌ নিয়ে দেশে ফিরলেন। রাজবংশের পুরোনো রীতি বজায় রইল; নতুন বৌ-এরও মনে কোনো কষ্ট রইল না।

এই হচ্ছে গ্যোটা খালের ইতিহাস। গ্যোটেবুর্গ থেকে গ্যোটা খালের পথে স্টকহলম হচ্ছে তিনশো ষাট মাইল। কিন্তু হ্রদ নদী বাদ দিলে এই পথে মানুষের কাটা খাল হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। এই পঞ্চাশ মাইল খাল কাটতে যদি হিসিঙ্গেনের রাজপুত্রের একবছর লেগে থাকে, সেইটাই বেশি বিশ্বাস্য, না টেলফোর্ডের মতো ইঞ্জিনিয়ারের লেগেছিল বাইশ বছর সেটাই বিশ্বাসের উপযুক্ত।

আমরা একবাক্যে স্বীকার করলুম—হিসিঙ্গের রাজপুত্রই এ খাল কেটেছেন, এর আর কোনো ভুল নেই।

কাপ্তেন বললেন—দেখুন একবার জ্যোৎস্না রাতের দিকে তাকিয়ে। দেখুন একবার খালের জলের ছবি। চুপটি করে শুনুন একবার স্টীমারের জল

কেটে যাওয়ার ঝর্ঝর শব্দ। চোখ বুজে ভাবুন এইখান দিয়ে রাজপুত্র তার বধূকে নিয়ে ঠিক এমনি এক রাতে তাঁর নিজের নৌকায় করে ফিরছেন। কতদিন আমি কাজের শেষে এই স্টীমারে বসে বসে চোখের সামনে হিসিঙ্গেন-রাজপুত্র আর তাঁর বধূর ভেসে যাওয়ার ছবি দেখেছি। খালের যে জায়গাটা সুন্দর লেগেছে, ভেবেছি হয়তো রাজপুত্র এইখানে নৌকো ভিড়িয়ে রাজবধূর হাত ধরে জমিতে গিয়ে নেমেছেন। এমনি জ্যোৎস্না রাতে খালের ধারে উঁচু জমিটার পাশে গাছের শিকড়ের উপর পাশাপশি বসেছেন। এই ধারা কত কি ছবি দেখেছি।

আমি কাপ্তেনের হাত চেপে বললুম—দোহাই কাপ্তেন! একটি অনুরোধ। আজকের এই জ্যোৎস্না রাতে এই উপবনের ধারে একবার থামান আপনার স্টীমারটা কয়েক মিনিটের জন্যে! চট্ করে নেমে একবার দেখে আসি চারিদিকের শোভা!

কাপ্তেন—হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন—আপনাদেরও দেখছি আমার মতো ভাবালসতায় পেয়ে বসেছে। উঁহুঃ, ওটি হবার যো নেই। আমি তো আর হিসিঙ্গেনের রাজপুত্র নই। আমি হচ্ছি এই জাহাজের কাপ্তেন। আমার হাত-পা বাঁধা। কাজের বাঁধনে নিয়মের বাঁধনে আমায় চলতে হয়। শুধু যখন ছুটি পাই, তখনই হচ্ছে আমার কল্পনার মেঘে চড়ে উধাও হবার সময়। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করলুম। রাত হয়েছে, আপনারাও নিশ্চয় ক্লান্তি বোধ করছেন।

এই বলে কাপ্তেন উঠে দাঁড়ালেন। আমরা বললুম—সময় নষ্ট আবার কি? এই পরিবেশের মধ্যে এমন চমৎকার গল্প—এতে কি আর সময়ের কথা কারো মনে থাকে? অনেক ধন্যবাদ কাপ্তেন, অনেক ধন্যবাদ!

কাপ্তেন বিদায় নিলেন। মিরেক বললে—জাহাজের কাপ্তেন এরকম কাব্যিক হতে পারে, গ্যোটা খালে না এলে এ আমার ধারণাই হত না।

মধ্যরাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। জাহাজের অন্যান্য যাত্রী

ততক্ষণে সব ঘুমে অচেতন। আমরাও তাই আর দেরি না করে বিদায়-বাচনের পর যে যার বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন মেম্ ছাড়িয়ে আমাদের স্টীমার ফিয়োর্ডএর মধ্যে দিয়ে বল্টিক সাগর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। আকাশে পাতলা মেঘ, জলের রং ঘোলাটে। সমুদ্রে এসে পড়তেই দেখলুম সে এক অদ্ভুত দেশ। সমুদ্রের জলে কে যেন মুঠো মুঠো নুড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে। এক-একটি নুড়ি হচ্ছে এক-একটি দ্বীপ। কত যে অসংখ্য দ্বীপ আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা করে নিয়ে আমাদের স্টীমার এগোতে লাগল। গাছের সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা দু চারটে বড় বড় দ্বীপ চোখে পড়ে, কিন্তু বেশির ভাগ দ্বীপই ছোট—তাতে আছে শুধু পাথর আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামুদ্রিক উদ্ভিদ। ছোট গোলাকৃতি দ্বীপগুলি এত সুন্দর যে মনে হয় একখানি ছোট্ট ঘর বেঁধে থাকবার উপযুক্ত জায়গা এর থেকে আর ভালো কিছুই হতে পারে না। দ্বীপগুলি যেই কাছে আসে অমনি উঁকি মেরে দেখি সেই নিরালা ঘরখানি কোথায়? কিন্তু কোনো দ্বীপেই মানুষের বাঁধা কোনো ঘর চোখে পড়ে না। কোনো দ্বীপেই কোনো বসতি নেই। শুধু সমুদ্রের নোনা জল সেই নির্জন দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়েছে।

মেঘলা আকাশের নীচে ফেনিল সমুদ্রের কিনারায় এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ক্রমে স্টকহলমে এসে পৌছলুম। সুইডেনের রাজধানী স্টকহলম। এখানে দু একদিন কাটিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে নরওয়ের রাজধানী অস্‌লোর দিকে। আমরা গিয়ে উঠলুম স্টকহলমের বিরাট যুথ হস্টেলে। সেখানে পাঁচ ছশো চরণিকের জায়গা। খুব কম জায়গাই খালি পড়ে আছে। এখানে এলে মনে হয় যেন সমস্ত সুইডেনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বাহিরটাকে দেখবার জন্যে। চারিদিকে খালি পিঠঝুলি। খাটের উপর, বারান্দার কোণে, খাবার টেবিলে, চেয়ারে, চরণিকের পিঠে কেবল ঐ একটি জিনিস চোখে পড়ে—পিঠঝুলি। ঘর-

ছাড়ারা সব কিছু ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—বিছানা, চাদর, লেপ, কম্বল, ইস্ত্রি করা কাপড়, নেকটাই, পালিশ করা জুতো, পেয়ালা, পিরিচ, কাঁটা চামচ,. হাঁড়িকুঁড়ি ডেকচি, ঘরের কোণের যত কিছু আরাম, যতকিছু সুবিধা বরবাদ করে সঙ্গে নিয়েছে পথের সাথী জীবনের সম্বল ঐ এক পিঠঝুলি। যতগুলি যাত্রী ততগুলি পিঠঝুলি।

স্টকহলমে আমরা মোটামুটি দুটি জিনিস দেখলুম। প্রথম হচ্ছে শহরের মাঝখানে চৌরাস্তার মোড়ে একটি টুপির দোকান। খুব দামী দামী সৌখিন টুপি এখানে পাওয়া যায়—শহরের বড়লোকের গিন্নীরা এখানে টুপি কিনতে আসেন। কিন্তু এ দোকানের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভাল টুপির জন্যে নয়। বিখ্যাত ছায়াচিত্র-তারকা গ্রেটা গার্বো ছায়াচিত্রে নামবার আগে টুপি বিক্রী করতেন এই দোকানে—এই কারণে এই দোকানের এত নাম। দলে দলে বিদেশী—যারাই স্টকহলম দেখতে আসে তারাই এই দোকান দেখতে আসে। আমরাও গেলুম। তবে সারি সারি নানা আকৃতির টুপির বদলে গ্রেটা গার্বোকে দেখতে পেলেই আমরা খুশী হতুম।

স্টকহলম-এর দ্বিতীয় দৃশ্য হচ্ছে স্কানসেন। লণ্ডনের ছাত্র ক্লাবের আমার একটি সুইডিশ বন্ধু তখন স্টকহলম-এ ছিল। তাকে খুঁজে বার করলুম।

কাইজা হঠাৎ আমাদের দেখে কি যে করবে ভেবে পেলে না। খুব রাগ করল যখন শুনলে যে আর মাত্র একদিন আমরা স্টকহলম্-এ থাকব। কাইজা বললে—একদিনে কখনও স্টকহলম্ দেখা যায়? কি তোমাদের দেখাবো, কোন দিক থেকে আরম্ভ করব কিছুই যে ভেবে পাচ্ছি না।

আমরা কাইজাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললুম—আমরা ইতিমধ্যেই গ্রেটা গার্বোর টুপির দোকান দেখে নিয়েছি, কাজেই আর একটা কিছু দেখবার মতো দেখতে পেলেই আমরা খুশী হই।

কাইজা একটু ভেবে বললে—ঠিক হয়েছে। চলো তবে সকলে মিলে স্কানসেন।

—সেটা আবার কি ?

—চলো গেলেই দেখতে পাবে, বুঝিয়ে বলতে হবে না।

স্কানসেনকে বলা যেতে পারে স্টকহলম্-এর প্রমোদ উদ্যান। কিন্তু প্রমোদ উদ্যান শুনলে যে ছবি মনে আসে এটা তা নয়। এটা বড়লোকের প্রমোদ-কানন নয়—এর অধিকার জনসাধারণের। এবং সেই কারণে এখানে আমোদের সঙ্গে প্রচুর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রাজধানীর উপকণ্ঠে একটা গোটা দ্বীপের উপর এই স্কানসেন পার্ক। পার্কের বিভিন্ন অংশে এক এক রকমের ব্যাপার। ছোটদের খেলার জায়গা, ছোটদের রঙ্গমঞ্চ, ছোটদের বায়োস্কোপ এবং চিঁড়িয়াখানা এক অংশে। বড়দের হাল্কা গান-বাজনা, ওস্তাদি গান-বাজনা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য আরেক অংশে। মিউজিয়াম, বক্তৃতা-মঞ্চ, নানা রকম ক্রীড়াভূমি আরেক অংশে। মিউজিয়াম-ভূমিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে ঐতিহাসিক যুগ থেকে সুইডেনে যত রকম গোলাবাড়ি ছিল তারই একটা সংগ্রহ। ছোট ছোট পুতুল খেলার বাড়ি নয়; গোটা গোটা বাড়িগুলোকে বয়ে এনে স্কানসেন-এর মিউজিয়ামে বসিয়ে দিয়েছে। এই রকম সংগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। এমনি আরো কত কি আছে। আর সব জায়গায় আছে সুন্দর সুন্দর কফিখানা, 'মিল্ক্ বার' আর রেস্তরাঁ। স্কানসেনের উপভোগ্য যা কিছু উপভোগ করে সেখানকার কফিখানায় আর রেস্তরাঁয় অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে এবং কাইজাকে প্রাণের সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা স্টকহলম-এর পালা শেষ করলুম।

॥ ৭ ॥

এইবার আমাদের পাড়ি জমাতে হবে অজানা অচেনা পথে, অজানা অচেনা মানুষের গাড়ি থামাতে থামাতে। এবারকার লাফাযাত্রায় চাই বড় বড় লাফ—রামচন্দ্রের হনুমানের মতো। নইলে এ যাত্রাই শেষ করে উঠতে পারব না।

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লুল স্টকহল্‌ম থেকে। একখানা ট্রামে করে চললুম শহরতলীর দিকে—সেইখান থেকেই হবে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা ঠিক করেছিলুম আজকের দিনের শেষে গিয়ে পৌছব 'উপ্‌সালা' পর্যন্ত। স্টকহল্‌ম্‌ থেকে অস্‌লোর সোজা পথে উপ্‌সালা পড়ে না। কিন্তু উপ্‌সালা হচ্ছে সুইডেনের নালন্দা। সুইডেনের প্রথম এবং প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। সমস্ত সুইডেন থেকে এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে। কাজেই স্টকহল্‌ম্‌-এ এসে উপ্‌সালা না দেখে যাওয়া যায় না।

ট্রামে করে চলেছি তো চলেইছি। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। শেষে ট্রাম এসে যখন একটা গুমটিতে ঢুকল, আমরা কন্‌ডাকটারের মুখের দিকে তাকালুম। কন্‌ডাকটার আমাদের মুখের দিকে তাকালো। কি সর্বনাশ, এ আমরা কোথায় এলুম? এ যে একেবারে শহরের মধ্যিখান। অপ্রস্তুতের ভাবটা যতটা পারি ঢেকে দুজনে ট্রাম থেকে নামলুম। বিদেশে ভাষা না জানার ফলে ভুল ট্রামে উঠে এই প্রথম ঠকা হল।

আমরা তখন হাঁটতে শুরু করলুম। রাস্তার মোড়ে খুঁটির গায়ে দেখে নিলুম কোন দিকে শহরতলী। তারপর দিলুম সেইদিকে পা চালিয়ে। ঠিক করলুম, আর ট্রামে উঠে ভুল করব না।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শার্ট গায়ে পিঠঝুলি পিঠে হাঁটতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু শহর তো ছোটো নয়—হাঁটছি তো হেঁটেই চলেছি। বহু মোটর গাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না শহর শেষ হয় ততক্ষণ গাড়ি থামাবার চেষ্টা করা বৃথা। কোন গাড়ি যে কোন দিকে যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। হাঁটতে হাঁটতে শহর ক্রমে পাতলা হয়ে আসে, কিন্তু ফুরোতে যেন চায় না। সব সময়ই মনে হয়, এইবার বোধ হয় বাড়ির সারি শেষ হল। কিন্তু দু পা এগিয়েই রাস্তার ধারে আবার একটা শহুরে বাড়ি চোখে পড়ে। যে সব গাড়ি আমাদের পার হয়ে চলে যায় তাদের আমরা লক্ষ্যই করি না, কিন্তু হঠাৎ এক সময় আমাদের দুজনেরই চোখ গিয়ে পড়ল একটা লরির উপর। মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মতো কে যেন বললে—এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো আমাদের দুজনেরই হাত উঠলো এবং লরিটা এসে দাঁড়াল রাস্তার এক পাশে।

এ কদিনের মধ্যে যে কটা সুইডিশ শব্দ না জানলে চলে না আমরা রপ্ত করে নিয়েছিলুম।

'নমস্কার', 'শুভপ্রভাত', 'শুভদিন', 'আপনি কি অমুক শহরের দিকে যাচ্ছেন?', 'আপনি কতদূর যাচ্ছেন?', 'আপনার গাড়িতে জায়গা হবে তো?', 'ধন্যবাদ', 'প্রচুর ধন্যবাদ' এই গুটিকতক কথা, সহজ সাধারণ কথা, শিখতে কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু স্থান কাল বুঝে মিষ্টি হেসে বলতে পারলে অনেক সুবিধা। সত্যি কথা বলতে কি, এই কটা কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে না পারলে ভদ্রভাবে লাফা-যাত্রা করাই মুশকিল।

আমরা আমাদের নবলব্ধ সুইডিশ বিদ্যার প্রয়োগ করতে করতে লরির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলুম।

মিরেককে বললুম—এটা কি হ'ল?

মিরেক বললে—লাফা-যাত্রা।

ড্রাইভার যদি ইংরেজী কিংবা জার্মান বোঝে তা'হলেই কিছু বাক্যালাপ চলে, আর তা নৈলে চুপচাপ বসে বাইরের দৃশ্য দেখা, আর নামবার সময়

এলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়া। আমাদের এ ড্রাইভারটি সুইডিশ ছাড়া কোনো ভাষাই জানতেন না, কাজেই গাল-গল্প কিছুই হল না। কিছু দূরে গিয়ে ড্রাইভার আমাদের একটা তেমাথার মোড়ে নামিয়ে দিলেন এবং দেখিয়ে দিলেন উপ্‌সালার রাস্তা কোনটে।

সেই রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। এবারে খালি গাড়ি দেখলেই আমরা হাত তুলতে থাকলুম। পাঁচ ছ'টা গাড়ি বেরিয়ে গেল, কেউ থামলো না। শেষে যে থামলো সে হচ্ছে আর এক লরিচালক। লরিতে উঠে বসতে মিরেক বললে—আমার মনে হচ্ছে, লরিওয়ালাদের সঙ্গেই লাফা-যাত্রীদের বন্ধুত্বটা বেশি। তোমার কি মনে হয়?

আমি বললুম—যা দেখছি তাতে করে আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

আমাদের লাফা-যাত্রা শেষ হবার পর আমরা যখন হিসেব নিয়েছিলুম দেখেছিলুম, আমরা যদিও লরির চেয়ে প্রাইভেট গাড়িতেই বেশি চড়েছি, কিন্তু গাড়ি থামাবার বেলা প্রাইভেট গাড়ি থামাতে আমাদের যা কষ্ট হয়েছে তার তুলনায় লরি থামাতে কিছুই হয় নি। যাই হোক, এ লরিটা আমাদের এক গ্রামের ধারে নামিয়ে দিয়ে গেল।

তখন দুপুর হয়েছে। রাস্তার গাড়ি চলাচলও একটু কম মনে হল। আমরা ঠিক করলুম, গাড়ি-চালকেরাও যেমন সবাই লাঞ্চ খেতে গেছে আমরাও এই বেলা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে ফেলি। এই ভেবে গ্রামের কল থেকে জল এনে একটুকরো ঘেসো জমির উপর আমরা আমাদের স্পিরিট স্টোভে রান্না চড়িয়ে দিলুম।

খাবারের শেষ গ্রাস সবে মুখে দিয়েছি, জল খাওয়া তখনো বাকি এমন সময় দেখি অনতিদূরে বড় রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। মোটর চালকদের বোধ করি লাঞ্চ খাওয়া শেষ হল। মিরেক খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে—চলো শিগ্‌গির পিঠঝুলি গুটিয়ে রাস্তার ধারে। ঐ দেখ সব ভাল ভাল খালি খালি গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললুম—রোসো মিরেক, এক ঢোক ঠাণ্ডা জল অন্তত খেয়ে নিই, চা ফুটিয়ে নেবার তো সময়ই দেবে না দেখছি।

মিরেককে তখন লাফা-যাত্রার উৎসাহে পেয়ে বসেছে। সে আমার পিঠঝুলির দড়ি বেঁধে পিঠে তুলে দিয়ে বললে—চলো, ওঠো।

উঠলুম। দৌড়ে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলুম একখানা গাড়ি আসছে। গাড়ির পিছনটা খালি মনে হল। গাড়িটা থামিয়ে দুজনে তাতে উঠে বসলুম এবং চালকের সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তিনি ইংরেজী জানেন। খুব আলাপী লোক। ব্যবসা উপলক্ষে রাজধানীতে গিয়েছিলেন। ফিরছেন বাড়ি—'সিগটুনা' শহরে।

একটু আলাপের পরেই বললেন—সিগটুনা শহর ছাড়িয়ে মাইল ছয়েক দূরে আমি একটি ছোট্ট বাগান-বাড়ি বানিয়েছি। আমি হচ্ছি কন্‌ট্রাকটার। পরের বাড়ি বানানো আমার পেশা; এই প্রথম নিজের বাড়ি করলুম। যাবেন নাকি বাড়িখানা দেখতে? ছোট্ট কুটির, বিশেষ কিছু নয় তবে হ্রদের ধারটি এমন সুন্দর যে দেখলে আপনারা খুশী হবেন।

আমরা তাড়াতাড়ি ম্যাপ খুললুম। দেখলুম, সিগ্‌টুনা যেতে গেলে আমাদের উপ্‌সালার পথ ছেড়ে অন্যদিকে চলে যেতে হয়। কিন্তু মুখে বললুম—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনার বাড়িতে যেতে বলছেন এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। তবে সিগ্‌টুনা শহর ছাড়িয়ে গেলে কি আজ আবার এই বড় রাস্তায় পৌছতে পারব? আমাদের যে আজই উপ্‌সালা যাওয়া দরকার।

কন্‌ট্রাকটার বললেন—সে জন্যে ভাববেন না। উপ্‌সালা যাবার যথেষ্ট গাড়ি পাবেন। চলুন আমার প্রিয় কুটির আপনাদের দেখিয়ে দি। আপনারাও যখন নিজেদের দেশের অপরূপ হ্রদের ধারে নিজেদের কুটির বানাবেন তখন মনে পড়বে এই সুইডিশ কন্‌ট্রাকটারের কথা।

এর পরে আর কি বলব? নীরবে আত্মসমর্পণ করলুম। কন্‌ট্রাকটারের গাড়ি সিগ্‌টুনা শহরের দিকে বেঁকল। তারপর শহর পার হয়ে প্রবেশ করল

যেন এক স্বপ্নরাজ্যে। দুদিকে ঘন উইলো গাছের শ্রেণী। তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। রাস্তার ধারে বুনো ফুলের রঙিন গালিচা। যেখানে একটু ফাঁক সেইখানেই চোখে পড়ে হ্রদের নীল জল আর জলের মধ্যে নলবন; নলবনের ফাঁকে বুনো হাঁস লুকোচুরি খেলছে। এই রাস্তা দিয়ে শেষে আমরা গিয়ে হাজির হলুম কন্‌ট্রাকটারের বাগান বাড়িতে। বাড়ির গায়ে একটি চিক-ঢাকা বারান্দা। সেখানে বেতের চেয়ারে বসে আমরা দেখলুম রোদের আলোয় হ্রদের জল টলমল করছে। এমন টলটলে জল যে মনে হয় এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ি।

মিরেক বললে—এমন খাসা যায়গায় আপনি বাড়ি করেছেন, এখান থেকে এখন আমাদের উঠতেই ইচ্ছে করছে না।

কন্‌ট্রাকটার বললেন—তবে বসুন, আপনাদের জন্যে কিছু রান্না চড়িয়ে দি। সবই আছে—এখনই হয়ে যাবে।

আমরা বলে উঠলুল—কি সর্বনাশ, আমরা যে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়েছি। আর তাছাড়া, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমাদের যে এখনি উপ্‌সালার পথে ছুটতে হবে, আপনি কি ভুলে গেলেন ?

কন্‌ট্রাকটর বললেন—সে হবে হবে, ভুলি নি। আপনাদের বড় রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি। আচ্ছা বেশ, তবে একটু শরবত খান। এই বলে ঝি-কে ডেকে বলে দিলেন শরবত দিতে।

ঝি এসে শরবত আর স্যাণ্ডুইচ দিয়ে গেল। আমরা তাই খেতে খেতে হ্রদের শোভন দৃশ্য দেখতে লাগলুম। জায়গাটা এত সুন্দর, দিনটা এত চমৎকার যে সহজে সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত পরোপকারী কন্‌ট্রাকটারই আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে বেলা থাকতে উপ্‌সালা পৌঁছতে গেলে এইবার উঠতে হয়।

—তবে আপনারা যদি গরিবের কুটিরে একটা রাত কাটাতে ইচ্ছে করেন নিজেকে আমি ধন্য বোধ করব। বলেন তো সব বন্দোবস্ত করে ফেলি।

ভদ্রলোকের অতিথিবৎসলতায় আমরা মুগ্ধ হলুম। কিন্তু মিরেক একবার একটা কিছু প্ল্যান করে ফেললে সহজে তার নড়চড় করত না। তাই আমরা প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, উপ্‌সালায় আজই আমাদের পৌছান নিতান্ত দরকার।

আবার সেই অতুলনীয় পথ দিয়ে আমরা ফিরে চললুম—হায়, ভ্রাম্যমানের জীবনে সব কিছুই আসে যায়, কিছুই স্থিতিশীল নয়। সুন্দরকে যে কিছুক্ষণ আঁকড়ে থাকব, সে উপায় নেই। সিগ্‌টুনা শহরকে ডাইনে রেখে আমরা অবশেষে উপ্‌সালা যাবার বড় রাস্তায় গিয়ে পৌছলুম। সেইখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক সিগ্‌টুনায় নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। যাবার আগে নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে বললেন—আমরা যদি ভারতবর্ষ আর চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মনে করে এক লাইন চিঠি লিখি, তিনি খুশী হবেন।

উপ্‌সালার পথে আমরা হাঁটতে লাগলুম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর, অনেকগুলো গাড়ি না-থেমে চলে যাবার পর একটা গাড়ি থামল। প্রকাণ্ড মোটা একজন লোক চলেছেন উপ্‌সালাতেই। দু-এক কথায় জানা গেল, তিনি উপ্‌সালারই একজন পাইকার। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় উঠবেন আপনারা ?

—য়ুথ হস্টেলে।

—য়ুথ হস্টেল ? কোথায় সেটা ? ঠিকানা আছে ?

আমরা য়ুথ হস্টেলের গাইড বইটা বার করে তাঁর চোখের সামনে ধরলুম। শক্ত শক্ত সুইডিশ নামের রাস্তাগুলোর নাম উচ্চারণ করতে আমাদের সাহসে কুলোলো না। তিনি পড়ে নিয়ে বললেন—চলুন, আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আসি।

উপ্‌সালার য়ুথ হস্টেলে দুটি ডেনিশ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। তারাও স্টকহল্‌ম্‌ থেকে সবে উপ্‌সালায় এসে পৌচেছে। তবে লাফা-যাত্রা করে আসে নি, এসেছে সাইকেলে। তারা আমাদের জিজ্ঞেস করলে—আপনারা উপ্‌সালা দেখবেন না চলে যাবেন ?

আমরা বললুম—দেখবারই ইচ্ছে। তবে আজ আর পারব না, কাল সকালে যাবো।

তারা বললে—আমরাও তাই ঠিক করেছি। কাল তবে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

আমরা বললুম—আমাদের তো সাইকেল নেই। আমরা যে পায়ে হেঁটে যাবো।

সাইক্লিস্ট্‌রা বললে—পায়ে হেঁটে আমরাও যাচ্ছি। সাইকেলে চড়ে আমাদের পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে ; একটু জিরন নেওয়া দরকার।

আমি বললুম—তারপর হেঁটে হেঁটে যখন আবার পায়ে ব্যথা হবে তখন বুঝি সাইকেলে চড়ে জিরন নেবেন ?

সাইক্লিস্ট্‌রা বললে—ঠিক তাই।

আমরা মনে মনে সাইক্লিস্ট্‌দের নমস্কার করে সেদিনের মতো ঘুমতে গেলুম।

পরদিন সেই দুজন সাইক্লিস্ট্‌ আমাদের সঙ্গে হেঁটে বেরল শহর দেখতে। উপ্‌সালার বিশ্ববিদ্যালয়, উপ্‌সালার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ক্যাথিড্রাল এবং উদ্ভিদ্‌-উদ্যান এই হচ্ছে সেখানকার দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় যা দেখতে আগন্তুকরা সবাই যায়। কিন্তু আমাদের মনে হল, উপ্‌সালার আসল দৃশ্য সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এরাই উপ্‌সালার পথপ্রান্ত, পাঠমন্দির, তার অঙ্গন আর দোকান, রেস্তোরাঁ, কফিখানাগুলিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এরা বাইরে বেরতে হলেই মাথায় একরকম গোল টুপি পরে—ছাত্রই হোক আর ছাত্রীই হোক—একই টুপি—কালো জমির উপর শাদা পাড়। এই টুপিতে চমৎকার মানায় এদের। বহুদূর থেকে চেনা যায় উপ্‌সালার ছাত্র-ছাত্রীদের। এরা যখন দল বেঁধে গান গাইতে শুরু করে, সে যেন এক সংক্রামক রোগের মতো। একবার কেউ আরম্ভ করলেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বেলা বাড়ছিল। আমরা আমাদের দুই সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

উপ্‌সালার উপকণ্ঠের দিকে পা বাড়ালুম মোটর গাড়ির খোঁজে। ডেনিশ ছেলে-দুটি হস্টেলে ফিরে গেল তাদের সাইকেল সংগ্রহ করতে। যাবার সময় বলে গেল—হেঁটে হেঁটে আর পারছি না—এইবার যাই একটু বিশ্রাম করিগে।

মিরেক বললে—সাইকেলের উপর বিশ্রাম বুঝি ?

ছেলে দুটি বললে—ঠিক তাই !

এরপর শীঘ্রই পর পর দুটো লরি আমরা পেয়ে গেলুম। প্রথম লরিটা যদিও আমাদের বেশিদূর এগিয়ে দিতে পারে নি, কিন্তু দ্বিতীয়টা নিয়ে গেল বহুদূর। দু-ঘণ্টার উপর একটানা চলেছি। যখন প্রায় মধ্যাহ্ন উপস্থিত, লরি-চালক একটু লজ্জিত মুখে বললে—কাছেই আমার ভাই-এর বাড়ি। সেখানে একবারটি নেমে চট্ করে যদি দুটো রুটি মুখে গুঁজে আসি, আপনাদের কিছু অসুবিধে হবে কি ? দশ মিনিটের বেশি সময় আমি নেব না।

আমরা মহা বিব্রত হয়ে বললুম—সে কি কথা ? আপনি লাঞ্চ খেয়ে আসুন ভালো করে। দশ মিনিট কেন—যত সময় লাগুক।

ড্রাইভার রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে নেমে গেল।

মিরেক বললে—একেই বলে ভদ্রতা। দেখলে কথা বলবার ধরন ? গাড়িটা যেন তোমার-আমার। উনি হলেন আমাদের মাইনে করা ড্রাইভার।

দশ মিনিটের কড়ারে গিয়েছিল ড্রাইভার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল রুটি আর মাংস চিবতে চিবতে। ফিরে এসে এক লাফে লরির সীটে বসেই লরি নিয়ে উধাও।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা এক বনের ধারে এসে পৌছলুম। সেইখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে লরি চলে গেল। বনের মধ্যে সরু সরু পাহাড়ী পাকদণ্ডি। তারই একটা ধরে আমরা বনের মধ্যে উঠতে লাগলুম। অনেক উঁচুতে উঠে শেষে একটা ঝরনা পাওয়া গেল। ঝরনার জলে হাত-মুখ ধুয়ে এক পাত্র ঝরনার জল ফুটিয়ে তরকারির স্যুপ করতে বসে গেলুম আমরা।

পিঠঝুলিতে সবই ছিল। স্যুপ চাপিয়ে দিয়ে আমরা বনের মধ্যে দুজনে দুদিকে চলে গেলুম খুঁজতে—যদি কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য পাওয়া যায়—যেমন ব্যাঙের ছাতা কিংবা সুমিষ্ট বেরি। অনেক খুঁজেও কিন্তু কেউ কিছু পেলুম না। ফিরে এসে স্যুপ রুটি-টুটি খেয়ে সবে একটু ঝরনার ধারে জিরব বলে বসেছি, এমন সময় শুনতে পেলুম বনের নীচে রাস্তার উপর মোটারের হর্ন। বুঝলুম মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে মোটার চালকেরা আবার রাস্তায় বেরিয়েছে। আর বসে থাকা যায় না। পিঠঝুলি বেঁধে নামলুম দুজনে বনের পথ দিয়ে নীচে। তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার চলতে লাগল চলন্ত গাড়ি থামাবার প্রচেষ্টা।

গাড়ি থামাবার বিদ্যেটা সড়গড় হয়ে আসছিল। এখন আর আগের মতো গাড়ি না থামলে লজ্জা বোধ করি না; কেউ মুখের উপর হেসে গেলেও বিব্রত হই না। গাড়ি থামলে অতি সহজভাবে, যেন নিজেরই গাড়ি এইরকম ভঙ্গিতে গাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে বসি। তারপর বাঁধা বুলিতে ভদ্রালাপ হয়—কতদূর যাচ্ছেন? আমাদের অমুক জায়গায় নামিয়ে দিতে পারবেন?

সকালের দিকে যেমন লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসেছিলুম, এবারে আমাদের গতি ক্ষীণ হয়ে এল। বনময় এই জায়গাটায় গাড়ি বিরল। হাঁটছি তো হাঁটছিই—সাপের মতো আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু রাস্তা, দু'পাশে বন উপবন। কিন্তু গাড়ির আওয়াজ, যার জন্যে কান আমাদের উদ্‌গ্রীব তা আর কানে আসে না। শেষে বিকেলের রোদ যখন সোনালী হয়ে এসেছে তখন যে গাড়িটা আমরা থামালুম তাতে ছিল দুজন কারখানার মজুর। তারা কাজের শেষে নিকটস্থ একটা হ্রদে স্নান করতে চলেছে। বনের অংশ পার হয়ে আমরা হ্রদের কাছে এসে পৌছলুম।

মজুররা বললে—হ্রদে স্নান করবেন না?

হ্রদের জল দেখলুম রাস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ নীচে। জলের মধ্যে বড় বড় গোল পাথর, তার উপর বহু স্নানার্থীর ভিড়। পড়ন্ত রোদের আলোয় সেখানে একটা মেলা লেগে গেছে। মিরেক ততক্ষণে তার ম্যাপ আর গাইড

বই খুলে দেখে নিয়েছে যে এখান থেকে আমাদের নিকটতম য়ুথ হস্টেল 'আভেন্তা' দশ-বারো মাইল দূরে। অর্থাৎ এখানে এখন স্নান করতে আর সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে সন্ধ্যার আগে আভেন্তা পৌছানোর সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কাজেই মজুরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই নিরুপম হ্রদ পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে চললুম নতুন গাড়ির খোঁজে।

এবারে ভাগ্যক্রমে যাঁদের পেয়ে গেলুম তাঁরা আভেন্তারই লোক। স্বামী স্ত্রী আর তাঁদের দুই মেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িতে জায়গার অভাব হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের তুলে নিলেন, বোধ হয় আসন্ন সন্ধ্যায় লাফা-যাত্রীদের নিঃসহায় অবস্থার কথা কল্পনা করে। আভেন্তায় পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। শহরের মধ্যে যখন ঢুকছি তখন কর্তাটি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আমরা নামব ?

—যেখানে হোক নামিয়ে দিন।

—আপনারা যাবেন কোথায় ?

—য়ুথ হস্টেলে।

—সে কি ? সে তো শহরের মধ্যে নয়। শহরের বাইরে প্রায় চার মাইল দূরে ; আপনারা যাবেন কি করে ? শেষ বাস-ও তো চলে গেছে।

আমরা জানতুম, সন্ধ্যার অন্ধকারে লাফা-যাত্রা চলে না, তাই বললুম—হেঁটে চলে যাবো।

—আচ্ছা চলুন, দেখা যাক কি করা যায়। বলে ভদ্রলোক শহর ছাড়িয়ে আমাদের নিয়ে চললেন এবং শেষে য়ুথ হস্টেলের দরজায় গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালেন।

এই এদের স্বভাব। সাহায্য করল না তো করল না। কিন্তু একবার সাহায্য করতে আরম্ভ করলে আর থামতে জানে না। ভদ্রলোক নিজে গাড়ি থেকে নামলেন। হস্টেলের পরিচালককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হস্টেলে আমাদের জায়গা হবে কিনা ? যখন শুনলেন, হবে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

॥ ৮ ॥

একটি সুন্দর কলকলমান নদীর ধারে আভেস্তা য়ুথ হস্টেল। নদীর কুলকুল সঙ্গীত আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করল যে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা জলে নামবার লোভ সামলাতে পারলুম না। ঠাণ্ডা হিম প্রবহমান জলে গা ধুতেই আমাদের সমস্ত দিনের ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

য়ুথ হস্টেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে মিরেক আর আমি খাবার টেবিলে ম্যাপ খুলে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি, এইবার কোন পথে যাওয়া যায় এবং পরের দিন কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা যেতে পারবে, এমন সময়ে দুটি ডেনিশ মেয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলে। তারাও আমাদেরই মতো লাফা-যাত্রিনী। তারা এসেছে সুইডেন দেখতে। কিন্তু আমাদের মতো চোখ বুজে নয়। তারা সুইডেনে আসবার আগেই সুইডেন সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করে এসেছে।

—একটা দেশ সম্বন্ধে যত পড়াশুনা করা যায় মানুষের চোখ ততই খুলে যায়, বুঝলেন? জ্ঞানের সেই খোলা চোখ নিয়ে তবে তো একটা নতুন দেশে ঢুকবেন? তা নইলে আর লাভ কি? নিজের দেশে বসে থাকলেই হতো! এই বলে মেয়ে দুটি আমাদের দিকে মনে হল যেন একটু কৃপার দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছে।

আমি খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললুম—পড়াশুনা আমরা না হয় ফিরে গিয়ে করে নেব। জ্ঞান-চক্ষু দুদিন পরেই খুলুক। সে তো একই কথা হলো।

মেয়ে দুটি বললে—একই কথা হলো মানে? নাঃ, আপনারা দেখছি নিতান্ত অনভিজ্ঞ যাত্রী। যাই হোক, সুইডেন সম্বন্ধে যখন বিশেষ কিছু জেনে

আসেন নি, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আপনাদের ওয়াকিবহাল করে তোলা।

এই বলে পালা করে দুজন মেয়ে সুইডেন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা শোনালো। সত্যি কথা বলতে কি, সাত দিনের মধ্যে আমি তার সমস্তই ভুলে গেলুম। মিরেকের কথা বলতে পারি না।

পড়াশুনো করে নিয়ে, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যে সুসজ্জিত হয়ে তারপর কোমর বেঁধে দেশ দেখতে বেরনো, এ আমার দ্বারা কোনোদিন হবে না। তাতে আনন্দ পাবো কি না তা-ও আমার সন্দেহ। সুতরাং ও নিয়ে আর মাথা ঘামালুম না। কিন্তু মেয়ে দুটি আমাদের যাত্রার গতিকে প্রধানত যেভাবে প্রভাবিত করলে তা হচ্ছে এই।

তারা বললে—সুইডেনে এসে সুইডেনের 'ডালার্না' অংশ না দেখে যদি আমরা চলে যাই তা হলে তার চেয়ে মূর্খের কাজ আর হতে পারে না।

'ডালার্না'র নাম পর্যন্ত এর আগে আমরা শুনি নি। ডালার্না কি? ডালার্না কোথায়? ডালার্না কত দূরে? এই সব প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, ডালার্না হচ্ছে সুইডেনের সুন্দরতম জেলা। আভেস্তা থেকে উত্তরে, লাফা-যাত্রায় প্রায় একদিনের রাস্তা। যদিও অস্‌লো যাবার সোজা পথে পড়বে না তাহলেও কালই আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত। সেখানে 'সিল্‌য়ান' হ্রদের তীরে 'র‍্যাটভিক্' নগর নাকি এক অপূর্ব স্থান।

আমাদের আর না বলবার উপায় ছিল না। আমি মিরেককে বললুম—কি মিরেক, যাবে নাকি?

মিরেক সেই মেয়ে-দুটির প্রখর দৃষ্টির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে বললে—চলো বরং গিয়েই দেখা যাক।

কথায় কথায় মেয়ে দুটিকে আমি জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা, তোমরা তো অভিজ্ঞ লাফা-যাত্রিনী। তোমরা লাফা-যাত্রা করো কি করে? গাড়ির পর গাড়ি যখন না থামে তখন?

মেয়ে দুটি বললে—খুব সহজ। তখন সোজা রাস্তার মাঝখানে চলে গিয়ে

পা ফাঁক করে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকি। গাড়ি বাবাজী আর তখন যাবেন কোথায়? থামতেই হয়। এই বলে তাদের একজন ঘরের মেঝেতেই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিল কি রকম করে গাড়ি থামাতে হয়।

মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালুম। তারপর চোখ বুজে কল্পনা করলুম রাস্তার উপর তার রণরঙ্গিণী মূর্তির ছবি। রাস্তা জুড়ে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কার সাধ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। লাফা-যাত্রার এ চিত্র আমাদের কাছে একেবারে নতুন। শুনেছিলুম পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক আছে যারা চলন্ত গাড়ি থামিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার চেষ্টা করে। তার মধ্যে এক শ্রেণীকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ট্র্যাম্প'। তারা আসলে নিঃস্ব। এক স্থান থেকে আরেকস্থানে যাবার সম্বল তো তাদের নেই-ই, হয়তো খাবার পরবার থাকবার সংস্থানও নেই। গাড়িতে উঠে ভিক্ষা চাওয়া এদের পক্ষে বিচিত্র নয়। এই ধরনের ট্র্যাম্পকে গাড়িতে জায়গা দিতে অনেকেই রাজী হন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হচ্ছে লাফা-যাত্রী—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হিচ হাইকার'। লাফা-যাত্রীরা ভিখারী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছাত্র। শখ করে দেশ দেখতে বেরিয়েছে। দূরগামী মোটর চালকের গাড়িতে যদি দু-একটা জায়গা খালি থাকে তাহলে তাতে একজন লাফা-যাত্রীকে বসিয়ে নিলে ক্ষতি কি? ছাত্রদের এতে পরম উপকার এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ হয়। ট্র্যাম্পদের পোশাক, পরিচ্ছদ ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা হয় আর লাফা-যাত্রীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ভাল জুতো পরে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়—যাতে দূর থেকেই মোটর চালক বুঝতে পারেন ট্র্যাম্প নয়, লাফাযাত্রী। তবুও অনেক সময় ভুল হয়, ট্র্যাম্প ভেবে হয়তো নিখাদ লাফাযাত্রীকে ফেলে কেউ চলে যান।

এই দুই শ্রেণীর যাত্রীই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই নবীনা লাফাযাত্রিনী-দুটি গাড়ি থামাবার যে প্রথার বর্ণনা করলেন তা শুনে আমরা রীতিমতো ঘাবড়ে গেলুম।

আমি বললুম—কি মিরেক? চেষ্টা করে দেখবে নাকি কাল ঐ নতুন প্রক্রিয়ায় গাড়ি থামাতে?

মিরেক বললে—পাগল হয়েছ? গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরবো।

আমি বললুম—কেন, মেয়ে দুটো তো দিব্যি বেঁচে আছে!

মিরেক বললে—ওদের কথা ছেড়ে দাও! ওরকম ভঙ্গি করে দাঁড়াতে তুমি পারবে?

পরের দিন সকালে পাট-ভাঙা শার্ট গায়ে চড়িয়ে জুতোয় পালিশ দিয়ে চকচকে করে নিয়ে মিরেক আর আমি বেরলুম দুজনে রাস্তায়। কিছুদূর হেঁটেই দেখলুম সেই ডেনিশ মেয়ে দুটিও বেরিয়েছে। তারা বললে, তারাও র‍্যাটুভিকে চলেছে। রাস্তায় তখনো গাড়ি নেই, খুব সকাল বলে হয়তো তখনও কেউ বেরয় নি। চারজনে মিলে খানিকটা হাঁটবার পর মেয়ে দুটি বললে—এ রকম করে সবাই একসঙ্গে গেলে তো চলবে না। একসঙ্গে চারজন দেখলে কোনো মোটরই থামবে না। দল ভাঙতে হবে।

আমি আর মিরেক না খেয়েই বেরিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম পথে কোথাও খেয়ে নেব। কাছেই একটা খাবার দোকানও সেই সময় চোখে পড়ল। তাই আমরা বললুম—বেশ তবে তোমরা এগোও। আমরা কিছু খেয়ে নিয়ে তোমাদের পিছনেই যাচ্ছি। আশা করি র‍্যাটুভিক্এ দেখা হবে।

মেয়ে দুটি এগিয়ে গেল।

খাবার দোকানটা ছিল রাস্তার উপরেই। রাস্তার ধারেই ছিল একটা বড় কাঁচের জানলা। সেই জানলার ধারে একটা টেবিলের পাশে আমরা কফি নিয়ে বসলুম। চোখ রইল রাস্তার উপরে। কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল গাড়িগুলোর উপর নজর রাখা। কটা গাড়ি খালি যাচ্ছে তার একটা হিসেব মনে মনে রাখা। যতক্ষণ বসে বসে আমরা দেখলুম, একটাও খালি গাড়ি সে-পথ দিয়ে যেতে দেখলুম না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ পিছনে শুনলুম

একটা লরির হর্ন-এর আওয়াজ। এই কদিনেই লরির ভেঁপু আর প্রাইভেট গাড়ির ভেঁপুর শব্দের পার্থক্যটা কেমন করে জানি না চিনতে শিখে ফেলেছিলুম। লরিটাকে দাঁড় করালুম। মাল-বোঝাই লরি ; তবে পিছনের দিকে একটা বেঞ্চি, তাতে ঠিক দুজনের মতো জায়গা। লাফিয়ে দুজনে উঠে পড়লুম। লরি ছেড়ে দিল।

খুব বেশি দূর যাই নি, মাইল খানেক হবে, হঠাৎ শুনি হৈ-হৈ চীৎকার। তারপরই আমাদের লরিটা জোরে ব্রেক কষে থেমে গেল। পিছন থেকে উঁকি মেরে আমরা দেখতে পেলুম, সেই দুই ডেনিশ মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে লরিকে থামতে বলছে—ঠিক সেই কালকের রাত্রে য়ুথ হস্টেলের খাবার ঘরে যে ভঙ্গি দেখিয়েছিল, সেই রকম। আমাদের দেখতে পেয়ে মেয়ে দুটি আরো একবার হৈ-হৈ করে উঠল। বললে—এই লরিতেই আমরা যাবো, আর হাঁটতে পারছি না।

কিন্তু লরি একেবারেই ভর্তি। আর এক তিলও জায়গা ছিল না। কাজেই লরিওয়ালা দুঃখ প্রকাশ করে আমাদের নিয়েই দিলে দৌড়। মেয়ে দুটি গলা ছেড়ে ডেনিশ কুচ-কাওয়াজের গান করতে করতে পা মিলিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। তাদের সেই প্রাণখোলা গানের স্বর মিহি হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

এই লরি থেকে নেমে আমরা একটা মোটার থামালুম। চালক তাঁর স্ত্রী ও ছোট্ট একটি খুকীকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। এঁদের সঙ্গে খুব লম্বা একটা পাড়ি হলো। প্রায় মাইল কুড়ি এঁরা আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী ইংরিজী জানা সত্ত্বেও কুড়ি মাইল পথ আমাদের সঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বললেন না। আমরা দুচার বার চেষ্টা করে হুঁ হাঁ ছাড়া আর কোনো জবাব বার করতে পারলুম না। কতরকম বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গেই যে পরিচয় হচ্ছে এই লাফা-যাত্রায় সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম।

এর পরে যে লরিটা থামল তার চালক আবার আলাপ-আলোচনার ফাঁকটা

দু-গুণ পুষিয়ে নিলে। বেচারা ভাঙা ভাঙা জার্মান জানে। কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে কথা কইবার উৎসাহে তার মুখে যেন খই ফুটতে লাগল। ব্যাকরণ-ট্যাকরণের কোনো কৃত্রিম বাধাই সে মানলে না। আর আশ্চর্যের বিষয় আমরা তার সমস্ত কথাই বুঝে ফেলতে লাগলুম। আমাদের কথা হচ্ছিল, সুইডেনের বন, পাহাড়, নদী, হ্রদ আর তাদের শোভা নিয়ে। আমরা একবার ঠাট্টা করে বললুম—সুইডেনের বন উপবনের সৌন্দর্য আমরা চোখেই দেখছি, কিন্তু আমাদের মনকে স্পর্শ করছে না।

—কেন? কেন? এই বলে চালক আমাদের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমরা বললুম—শুনুন তবে। বনের যেমন একটা বাইরের সৌন্দর্য আছে তেমনি একটা ভিতরের মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্যের সম্পর্ক হচ্ছে জিহ্বার সঙ্গে, উদরের সঙ্গে। এখানকার দু-একটা বনে ঢুকে তন্নতন্ন করে আমরা খুঁজে দেখেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক গুচ্ছ বেরি বা সুগন্ধি ব্যাঙের ছাতা আবিষ্কার করতে পারি নি। তাই যদি না পেলুম তবে আর এখানকার বনকে ভালবাসি কি করে বলুন তো?

ঠিক সেই সময়ে আমাদের লরি চলেছে একটি বনময় জায়গার মধ্যে দিয়ে। মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি তার পথ হারিয়ে ফেলেছে ঘন পত্রবিন্যাসের মধ্যে। রাস্তা হয়ে উঠেছে খাড়াই এবং সর্পিল। হঠাৎ ঘ্যাঁচাং করে ব্রেক কষে ড্রাইভার মশাই লরি থামিয়ে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়লেন। তারপর আমাদের দিকের দরজা খুলে বললেন—আসুন, নেমে আসুন।

কিছু বুঝতে না পেরে আমরা যন্ত্রচালিতের মতো নেমে পড়লুম এবং ড্রাইভারের সঙ্গে গিয়ে ঢুকলুম গভীর বনের মধ্যে। খানিকটা এগিয়ে একটি খরস্রোতা ছোট্ট নদী পাওয়া গেল। তার দুকূল সবুজ ঘাসে ভরা। ড্রাইভার দুহাত মেলে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে—দেখুন এবার চোখ মেলে—সুইডেনের অরণ্যের শোভা। বলুন, এই অরণ্যের নিন্দে করতে পারেন কি না!

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম নদীর দুই কূলে সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে

স্ট্রবেরির মেলা। যতদূর দেখা যায় ছোট ছোট লাল লাল বন্য স্ট্রবেরির যেন আর শেষ নেই। এত বিস্তৃত বুনো স্ট্রবেরির ক্ষেত আমি এর আগে কোথাও দেখি নি। মিরেক বললে সেও দেখে নি।

—দেখলেন তো? এবার চলুন ফিরে আপনাদের পথে পৌঁছে দি।

আমি বললুম—সে কি? এ জায়গা ছেড়ে কি আর এখন নড়া যায়? বিদায় বন্ধু—অনেক ধন্যবাদ যে এমন জায়গা চিনিয়ে দিয়ে গেলে।

মিরেক আর আমি তখনই পিঠঝুলি নামিয়ে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করতে লেগে গেলুম। লরিচালক হাসিমুখে ফিরে গেল। দুজনে মিলে প্রচুর স্ট্রবেরি সংগ্রহ করলুম। কি সুস্বাদু রসালো টুকটুকে লাল ফলগুলি। এমন সুন্দর বনভূমি সুইডেনে এসে অবধি আমাদের চোখে পড়ে নি। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরেও বহুক্ষণ আমরা সেই ঝরনার মতো নদীর ধারে ছায়াভরা সুশ্যামল ঘাসের গালিচার উপর বসে কাটিয়ে দিলুম।

এই কারণেই বোধ হয় সেদিন আমাদের র‍্যাট্‌ভিক পৌছন হয়ে উঠল না। কিংবা আরো একটা কারণেও হতে পারে, সেই কথাই এবার বলছি। কাঠ-কয়লার জ্বালে রান্না হয় জানতুম; মোটার চলে তা তো আর জানতুম না। আমাদের লাফা-যাত্রী কপালে জুটল এবার এক কাঠ-কয়লায় চলা মোটার। তা-ও যে-সে মোটার নয়, সুইডেনের একমাত্র কাঠকয়লায়-চলা মোটার। যাঁর গাড়ি তিনি নিজেই সে গাড়ির ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে গর্বও তাঁর কম ছিল না। কাঠকয়লায়-চলা গাড়ি জেনেও যে আমরা তাঁর গাড়ি থামিয়েছিলুম এতে তিনি এতো খুশী হয়েছিলেন যে, তখনই আমাদের কফি খাবার নিমন্ত্রণ করে বসলেন। আমরা অবশ্য গাড়ি দেখে মোটেই বুঝি নি সেটা কাঠকয়লায় চলে না পেট্রোলে চলে। যখন শুনলুম কাঠকয়লার গ্যাসে চলে তখন আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। তাছাড়া যাতেই গাড়ি চলুক, ঘুঁটেতে চললেই বা আমাদের কি এসে যায়? এর উপর যদি কফি-কেক কপালে জোটে সেইটেই মস্ত লাভ।

ভদ্রলোক চমৎকার এক কফিখানায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের নিয়ে ঢুকলেন এবং কাঠকয়লায় চালানো গাড়ি সম্বন্ধে বহু কথা বহু তথ্য প্রকাশ করলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হল পেট্রোলের চেয়ে কাঠকয়লা শতগুণে শ্রেয়। তারপর ভদ্রলোক বললেন, এই ধরনের ইঞ্জিনের এজেন্সি নিয়ে তিনি সারা সুইডেন ঘুরতে আরম্ভ করেছেন। এখনও পর্যন্ত যদিও কোনো অর্ডার যোগাড় করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস একবার যদি লোকে এর মর্যাদা বুঝতে আরম্ভ করে তাহলে দেখতে দেখতে সারা সুইডেন কয়লার গাড়িতে ছেয়ে যাবে।

সুইডেনে আজ কজন কয়লার গাড়ি চড়ছে আমার জানা নেই, কিন্তু গত যুদ্ধের সময় যখন পেট্রোলের অভাব ঘটেছিল তখন কলকাতায় বহু মোটারই যে কাঠকয়লার গ্যাসে চলত এ সবাই দেখেছে।

যাই হোক ভদ্রলোক কফি খেতে খেতে আমাদের গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করলেন। যখন শুনলেন, আমরা র‍্যাট্‌ভিক যেতে চাই, বললেন—বেশ চলুন, আমার গাড়িতেই আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি!

র‍্যাট্‌ভিক সেখান থেকে বহুদূর। আমরা জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি ঐ দিকেই যাচ্ছিলেন?

—মোটেই না। আমি যাচ্ছিলুম একেবারে উল্টো দিকে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমায় এখন সুইডেনের সব জায়গায় ঘুরতে হবে—গেলুমই না হয় র‍্যাট্‌ভিকে আজ। এই বলে কফি খাওয়া শেষ করে তিনি বেরলেন আমাদের নিয়ে। পথে কয়লার দোকান থেকে এক বস্তা কাঠ-কয়লা ঢেলে নিলেন।

কয়লা ঢালা সত্ত্বেও গাড়ি চল্লো ঢিমে তেতালা। বহু পথ আমাদের যেতে হবে। গাড়ির গতির কার্পণ্যে আমরা থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলুম। অনেক মোটার আমাদের ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। আমরা কিছুই বলতে পারলুম না। ভদ্রলোক কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অতি প্রসন্ন মুখে গাড়ি হাঁকিয়ে চললেন।

অবশেষে র‍্যাট্‌ভিকের কাছে এসে যখন পৌচেছে তখন দেখলুম সন্ধ্যা হয়ে আসতে আর দেরি নেই। তখন ভদ্রলোক নিজেই পরামর্শ দিলেন সন্ধ্যার সময়ে র‍্যাট্‌ভিক-এ নেমে কোনো লাভ হবে না। র‍্যাট্‌ভিক-এ কোনো য়ুথ হস্টেল নেই। নিকটতম য়ুথ হস্টেল র‍্যাট্‌ভিক ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরে 'ভিকারবুন' নামক ছোট্ট শহরে। সেখানে আজ রাত কাটিয়ে কাল সকালে র‍্যাট্‌ভিক-এ ফিরে আসাই যুক্তি-যুক্ত। আমরাও তাতে রাজী হলুম এবং ঠিক সন্ধ্যার মুখে ভিকারবুন-এ এসে পৌছলুম।

॥ ৯ ॥

ভিকারবুনে এসে সেখানকার য়ুথ হস্টেলে আমরা আশ্রয় পেলুম আর ভদ্রলোক স্থানীয় হোটেলে রাত কাটাতে চলে গেলেন। বলে গেলেন, কাল যদি খুব ভোরে আমরা না উঠি তাহলে তাঁর গাড়িতে করে র‍্যাট্‌ভিক দেখিয়ে অস্‌লোর পথে অন্তত একশো মাইল আমাদের এগিয়ে দিতে পারবেন।

—আমি একটু ঘুম-কাতুরে মানুষ। ভোরের দিকে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। তাই কিছু দেরি করে আসব বুঝলেন?

আমাদের কিন্তু কাঠকয়লার গাড়ি চড়ার শখ মিটে গিয়েছিল। তাই খুব ভোরে উঠেই আমরা সরে পড়লুম। য়ুথ হস্টেলের কার্যাধ্যক্ষকে বলে দিয়ে গেলুম, ভদ্রলোক এলে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে যে আমাদের বহুদূর যেতে হবে, তাই আর সময় নষ্ট করতে পারলুম না।

লোহার যন্ত্রপাতি ভরা একখানা গাড়িকে থামিয়ে তাইতে চেপে আমরা র‍্যাট্‌ভিকে যখন পৌছলুম তখন সকাল ন'টা। মিরেক বললে—এতক্ষণে বোধহয় কাঠকয়লায় আগুন দেওয়া হচ্ছে।

আমি বল্লুম—তাই হবে। এসো এখন র‍্যাট্‌ভিক দেখা যাক।

সিল্‌য়ান হ্রদের তীরে র‍্যাট্‌ভিক দেখে আমাদের একটুও ভাল লাগল না।

সেখানে য়ুথ হস্টেল নেই আগেই বলেছি, কিন্তু আছে হ্রদের ধারে এক সুসজ্জিত হোটেল—বড়লোক 'টুরিস্ট'দের ভিড় সেখানে। ডালার্নার চাষীদের রংবাহার পোশাকের কথা শুনেছিলুম কিন্তু র‍্যাট্‌ভিকে তার কোনো পাত্তা পেলুম না। শহরে যে একটি মিউজিয়াম আছে সেখানেও কোনো গ্রাম্য পোশাকের চিহ্ন দেখতে পেলুম না। মোটের উপর র‍্যাট্‌ভিক হচ্ছে সুন্দর হ্রদের ধারে 'টুরিস্ট'-শহর—সুইডেনের বিশেষত্ব কিছু সেখানে নেই। যে দুটি ডেনিশ মেয়ের প্ররোচনায় এবং উৎসাহে এখানে এসেছি তাদের উপর রাগ হল। কিন্তু কোথায় আর তাদের পাবো?

যাই হোক, ভাবলুম র‍্যাট্‌ভিক তো হল না, ডালার্নার বিখ্যাত হ্রদ সিল্‌য়ান —তার ধারে ধারে ছবির মতো সুন্দর সব শহর, তাই দেখতে বরং বেরিয়ে পড়ি। এই ভেবে হ্রদের ধারে চলতে শুরু করলুম 'মোরা' শহরের উদ্দেশে। কিছু এগিয়েই এবার যাঁদের গাড়ি থামালুম তাঁরা হচ্ছেন একটা সার্কাস পার্টির লোক। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি, তার মধ্যে তিনজন মহা ফুর্তিবাজ ছেলে। তাদের একজন তারের উপর সাইকেলের কসরত দেখায়, একজন ম্যাজিক করে আর একজন সাজে সং। ভারি হৃদ্যতার সঙ্গে তারা আমাদের গ্রহণ করলে এবং ত্বরিত নিমন্ত্রণ জানালে তারা যে শহরে যাচ্ছে সেখানে চলে আসতে তাদের সঙ্গে। বনের ধারে এক শহর, সেখানে নাকি মস্ত মেলা হচ্ছে, আজ রাতে তাদের দলের খেলা। আমরা যদি যাই একটা 'বক্স' পাবো বিনা পয়সায় এবং সার্কাসওয়ালাদের তাঁবুতে আরামে কাটাতে পারব রাত।

অনুমোদনের আশায় আমি একবার মিরেকের মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু মিরেকের তখন বৈচিত্র্যে অরুচি ধরে গেছে। সে বললে—এভাবে সময় গেলে কবে আমরা নরওয়ে পৌছব? নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হল। ছেলেরা দেখলুম অতীব দুঃখিত হয়েছে। অবশেষে আমাদের 'মোরা'য় নামিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল সেই বনের ধারের মেলায়।

মধ্যাহ্ন তখন পেরিয়ে গেছে। আমরা ঠিক করলুম 'সিল্‌য়ান' হ্রদের ধারে কিছু রান্না করে নেব। এক টুকরো সুন্দর ঘেসো জমি বেছে নিয়ে আমরা

পিঠঝুলি নামিয়ে বসলুম। চারিদিক সবুজে সবুজ। সরস মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগে। সামনে মস্ত একটা জলা, তারপরই সিলয়ান হ্রদের রূপোলী জল। জায়গাটা সুন্দর হলে হবে কি আমাদের কপাল মন্দ। সত্যি কথা বলতে কি সুইডেনের মতো দেশে পাথুরে জায়গায় হ্রদের কোলের জলা-জমি যে খুব-গ্রীষ্মে এমন ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। আমরা সবে মাত্র স্পিরিট-স্টোভ দুটো বার করে মাটির উপর সাজাচ্ছি এমন সময় কানের কাছে কি যেন ভোঁ ভোঁ করে উঠল। কি ব্যাপার, না মশার দল! মশাগুলোকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরো অনেক মশা আমাদের তেড়ে এল। কোনোরকমে একটা স্পিরিট-স্টোভে আগুন ধরালুম। ততক্ষণে পায়ে এবং হাতে মশারা হুল ফোটাতে আরম্ভ করেছে। বাপ্ রে বাপ, সে কি হুল! সুইডেনের মশার কামড়ে আমরা তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু মশার হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছ কি অমনি ছেঁকে ধরেছে। ইয়োরোপে এ রকম অভিজ্ঞতা আমাদের কখনো হয় নি। দেখলুম রান্না করার চেষ্টা বৃথা। তাই কোনোরকমে উনুন-টুনুন গুটিয়ে পিঠঝুলি পিঠে নিয়ে দুজনে সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলুম। মিরেককে বললুম—বাংলাদেশে আমরা ঢের ঢের মশার উপদ্রব সহ্য করেছি বটে কিন্তু এরকম ব্যাপার আমার কল্পনারও বাইরে।

রান্না যখন করাই গেল না তখন একটা খাবার দোকানে দুজনে খেয়ে নিলুম এবং তারপর প্রস্তুত হলুম লাফা-যাত্রার জন্যে। মশার তাড়ায় 'মোরা' দেখবার উৎসাহ আমাদের চলে গিয়েছিল। সেই ডেনিশ মেয়ে দুটির এখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাদের দেখা কোথাও পেলুম না। পেলে একবার জিজ্ঞেস করতুম—হে বীরাঙ্গনাদ্বয়া, এবারে ডালার্নার কোন অংশে পরিভ্রমণ করব দেখিয়ে দাও।

চললুম সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো সিল্য়ান হ্রদকে পুবে রেখে। ডালার্নার দিকে আসবার সময় যতটা সহজে আমাদের লাফা-যাত্রা চলছিল, ডালার্না

সিগটুনার কাছে হ্রদ

ডেনমার্ক ও সুইডেনের পারাপারের জাহাজে লেখক

ছেড়ে যাবার সময় মোটেই তা হল না। বেশির ভাগ গাড়িই চলেছে দেখলুম বিপরীতমুখো। আমরা যেদিকে যেতে চাই সেদিক পানে বড় একটা গাড়ি আসতে দেখলুম না। অগত্যা আমরা হাঁটতে লাগলুম রাস্তা ধরে আর চারিদিকে চেয়ে প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম মোটারওয়ালাদের কাছে ডালার্নার আকর্ষণটা কোথায়? মাইলের পর মাইল সেদিন হেঁটেছি। দুটি একটি মোটার যা থামিয়েছি তারা খুব বেশিদূর আমাদের এগিয়ে দিতে পারে নি। কখন একটা জুতসই মোটার পাবো আর তাতে চড়ে ডালার্নার এই গণ্ডিটা পার হতে পারব এই ভাবতে ভাবতে আর হাঁটতে হাঁটতে শেষটা প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল।

বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হলো কোনো গাড়িই রাস্তা দিয়ে যায় নি—এক নাগাড়ে আমরা হেঁটেই চলেছি। সন্ধ্যা আসন্ন দেখে আমরা একটু চিন্তিত হয়ে ম্যাপ খুললুম। আর একটু অন্ধকার হলেই আজকের মতো লাফা-যাত্রা খতম। সুতরাং নিকটতম আশ্রয় কোথায় তা দেখা দরকার। ম্যাপে দেখলুম—পশ্চিমদিকে, যেদিকে আমরা চলেছি সেদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে আমাদের যুথ হস্টেল। পুব দিকে, যেদিক থেকে আমরা এলুম, ছ'মাইল দূরে একটা যুথ হস্টেল। যেদিকেই যাই আজকের এই পরিশ্রমের পর আরো এতটা পথ হাঁটা আজ পোষাবে না। কাজেই রাত ঘনিয়ে আসবার আগে একটা গাড়ি আমাদের চাইই চাই।

চাই বললেই অবশ্য গাড়ি আসে না। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ডালার্নার পথপ্রান্ত নীরব নিঃশব্দ হয়ে আসতে লাগল। উদ্‌গ্রীব কান পেতে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলুম আমরা, কিন্তু কোনো গাড়ির শব্দই কানে এল না। ক্রমে আমরা এক অজানা গ্রামের কিনারায় এসে পৌছলুম। গ্রামের প্রবেশ মুখে কয়েকটা উঁচু উঁচু টিনের গুদাম ঘর। ঘরগুলি খালি—মনে হয় তার মধ্যে থেকে মাল খালাস করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দরজায় কোনো তালা নেই। চাকার উপরে বসানো দরজা একটু ঠেলতেই সরে গেল। উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে দেখলুম। ভিতরটা ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যারা গুদাম ঘরকেও

ঝেঁটিয়ে ধুয়ে-মুছে তকতকে করে রাখে সেই সুইডিশদের মনে মনে তারিফ না করে থাকতে পারলুম না।

মিরেক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তায় এসে তাকে বললুম—মিরেক, নেহাতই যদি আজ আর কোথাও আস্তানা না পাওয়া যায় তাহলে এইখানে ফিরে আসা যাবে। বসে বসে গল্প করে রাত কাটিয়ে দেবার পক্ষে নেহাত মন্দ নয়। তা ছাড়া রান্না করা আর খাওয়ার বিশেষ অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

মিরেক বললে—ভাগ্যিস্ আমাদের মশায় তাড়া করেছিল! তা নইলে তো গিয়েছিল আলু পেঁয়াজগুলো আজ সকালেই শেষ হয়ে। বেঁচে থাকুক সিল্য়ান হ্রদের মশা।

তারপর আমরা গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। গুদাম ঘরগুলো দেখে আমাদের মনে হয়েছিল কাছেই গ্রাম। কিন্তু প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটেও গ্রামের কোনো চিহ্ন পেলুম না। ভাগ্যিস এই উত্তর দেশে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার অন্ধকার আমাদের দেশের মতো দ্রুত নেমে আসে না, তাই নিরুৎসাহ না হয়ে আমরা হেঁটে চললুম এবং মনে হল বহু দূরে গ্রামের আলো দেখা যাচ্ছে। ভাবছি, গ্রামে যাবো না সেই গুদাম ঘরে ফিরে যাবো? দূরত্ব দুইয়েরই প্রায় সমান। এখানকার গ্রামে যে কোনো হোটেল বা সরাই পাওয়া যাবে তার আশা খুবই কম। রাস্তার দুপাশে শুধু ধু-ধু শস্য ক্ষেত। এখানকার ছোট ছোট চাষীদের গ্রামে কয়েকটি চাষীর ঘর ছাড়া আর কিছুই হয়তো থাকবে না। সুতরাং শস্যের গুদামে ফিরে যাওয়াই হয়তো আমাদের পক্ষে শ্রেয়। এইসব ভাবছি এমন সময় চোখ ধাঁধিয়ে দুটো 'হেডলাইট' জ্বেলে একটা মোটার গাড়ি গ্রামের দিক থেকে আমাদের সামনে এসে পড়ল।

আমরা হাত তুলি নি। কারণ প্রথমত গাড়ি এসেছে আমাদের সামনে থেকে; চলেছে আমরা যেদিকে যেতে চাই তার উল্টো। দ্বিতীয়ত অন্ধকার আর 'হেডলাইট'-এর ফলে গাড়িতে কে কে আছে আমাদের দেখবার

উপায় ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, গাড়িটা আমাদের সামনে এসে একেবারে থেমে গেল। গাড়ি থেকে টপ্‌ করে নেমে এক ভদ্রলোক প্রথমে ভাঙা জার্মান, তারপর ভাঙা ইংরেজীতে বললেন—আপনাদের কোথাও পৌঁছে দিতে পারি কি ?

নির্বান্ধব দেশে অন্ধকারে আমাদের অবস্থা দেখে ভদ্রলোক দেখলুম বেশ চিন্তিত হয়েছেন।

আমরা শুধোলুম—আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন ?

—মোরা।

—অনেক ধন্যবাদ। আমরা সেইদিক থেকেই আসছি। আমাদের যেতে হবে সামনে। দেখি যদি অন্য কোনো গাড়ি পাই।

—এ অঞ্চলে এত রাতে অন্য গাড়ি পাবার সম্ভাবনা খুব কম। তা ছাড়া, যদিও পান, মোরা-যাত্রী গাড়িই পাবেন।

—তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে তো ? আজ রাতে কোনো একটা য়ুথ হস্টেলে আমাদের পৌঁছন চাই।

—মোরার পথে এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে একটা য়ুথ হস্টেল আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দিতে পারি।

—ফিরতি পথে আর আমাদের যাবার ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে বরং হাঁটি খানিকটা। এদিকে সরাই-টরাই কতদূরে কিছু জানেন ?

—আপনারা যে-দিকে যাচ্ছেন, সেদিকে সরাইখানাই বলুন বা য়ুথ হস্টেল বলুন এখান থেকে দশ মাইল। তার আগে কিচ্ছু নেই, শুধু ঐ যে গ্রাম দেখছেন ঐটি। ঐ হচ্ছে আমার গ্রাম।

—ওখানে সাধারণের থাকার বা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই তাহলে ?

—কিচ্ছু নেই। ছোট গ্রাম, ক-ঘরই বা চাষী আছে ? তবে আপনারা চাষীর ঘরে থাকতে চান তো আমি বলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। খরচ বেশি হবে বলে আমার মনে হয় না। অসুবিধে এই যে, সারা গ্রামে আমি

ছাড়া আর কেউ জার্মান বা ইংরেজী জানে না। আমি তো চললুম 'মোরা'—কাল সন্ধ্যার আগে ফিরবো না।

মিরেক আর আমি দেখলুম এ খুব চমৎকার প্রস্তাব। বললুম—ভাষার জন্যে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। বরঞ্চ আপনি যদি কোনো চাষীর বাড়িতে আমাদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দেন আমরা পরম উপকৃত হব।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। গাড়ির সামনের সীটে তাঁর স্ত্রী সেজেগুজে বসেছিলেন। দেখেই বোঝা যায় কোনো নিমন্ত্রণ বা অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে বেরিয়েছেন। আমরা ক্ষমা চাইলুম। মহিলা আমাদের কোনো কথাই বুঝলেন না। ভদ্রলোক শুধু বললেন—আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমরা মোরা-য় যাচ্ছিলুম একটা পার্টিতে, কিন্তু তার এখনও অনেক সময় আছে।

'ওইএ' গ্রামে আমরা যখন পৌঁছলুম তখন চাষীরা সবাই মাঠ থেকে গ্রামে ফিরে এসেছে। মুখ-হাতের ধুলো-বালি ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে কেউ কেউ তখন বাড়ির সামনে বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করছে। কেউ কেউ ঘোড়াকে খাওয়াচ্ছে আর তার তদ্বির করছে। গ্রামে খান পনের-কুড়ি ঘর তার মধ্যে একটি বাড়ি দোতালা। ভদ্রলোক সেই দোতালা বাড়ির সামনে নিয়ে আমাদের হাজির করলেন। গৃহস্বামী সব শুনে দুহাত বাড়িয়ে আমাদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং দোতালার চমৎকার দুটি ঘর আমাদের জন্যে ছেড়ে দিলেন। আমার ঘরের জানালা খুলে দিতেই দেখতে পেলুম ফিকে আকাশের গায়ে তখনও ডালার্নার দূর পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে আর তার কোলে সিল্‌য়ান হ্রদের জল অল্প আলোয় চক্‌চক্‌ করছে।

সেদিন মোটার চড়ার চেয়ে হাঁটাই হয়েছিল বেশি। কাজেই চাষী-বৌএর রান্না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও আর দেরি করলুম না। মিরেক তার নবলব্ধ সুইডিশ ভাষার জ্ঞান প্রয়োগ করবার কিছু চেষ্টা করেছিল খাবার টেবিলে। কিন্তু 'ওইএ' গ্রামের চাষাড়ে ভাষার কাছে তাকে সম্পূর্ণ হার মানতে হল।

পরদিন সকালে উঠে দেখি আমাদেরই জানলার নীচে একটা প্রকাণ্ড লরি, সাইকেল বোঝাই হয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। আমাদের দেখতে পেয়ে লরিওয়ালা হাত নেড়ে ডাকল। আমরা নীচে গিয়ে দেখি আমাদের গৃহস্বামীর নীচের ঘরে গ্রামসুদ্ধ ছেলে-বুড়ো সবাই জড়ো হয়েছেন। আমরা ঢুকতেই গৃহস্বামী প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন হতে লাগল। সকলেরই আমাদের সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে—কিন্তু হায়, ভাষার প্রতিবন্ধক কাটিয়ে ওঠা গেল না। অথচ এরই মধ্যে কয়েকটি লোক চোখ মুখ আর হাত নেড়ে এমনই ভাবে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন যে আমরা বেশ বুঝতে লাগলুম তাঁরা কি বলতে চান। তারপর একটি ছোট দল উঠে এসে আমাদের লরিতে উঠতে বললে, নিজেরাও লরিতে গিয়ে উঠল। মনে হল এরাই সাইকেলগুলির অধিকারী—এখন লরিতে চেপে যাচ্ছে, হয়তো ফিরবে সাইকেলে।

লরিওয়ালা একটা ম্যাপ খুলে জানতে চাইলে, আমরা কোন দিকে যেতে চাই। আমরা দেখিয়ে দিলুম, কিন্তু লরিওয়ালার মুখের ভাব দেখে বুঝলুম যে, সে মোটেই সন্তুষ্ট হয় নি, কারণ তার গন্তব্য পথে সে আমাদের খুব বেশি দূর পৌঁছে দিতে পারবে না।

গ্রামের সকলে লরির ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানালে। সে এক অভিনব দৃশ্য। মনে হল যেন কতকালের বাসিন্দা আমরা এই গ্রামের—কোথায় কত দূর দূরান্তরে চলেছি। ঝাঁকানি দিয়ে লরি ছেড়ে দিলে। তারপর ক্রমে 'ওইএ' গ্রামের দৃশ্য চোখের সামনে থেকে মুছে গেল।

যেখানে লরিটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল, সেখান থেকে পাঁচ মিনিটও বোধহয় হাঁটি নি, হঠাৎ দেখি একখানা গাড়ি, তাতে একজন মাত্র চালক, আমাদের কাছেই এসে পড়েছে। হাত তুলতেই গাড়িখানা থামল। কিন্তু কি সর্বনাশ, এ যে একটা মিটার লাগানো ট্যাক্সি! আমরা ভারি লজ্জিত

হয়ে প্রচুর ক্ষমা চেয়ে বললুম, ট্যাক্সি আমরা চাই নি। আমরা লাফা-যাত্রী।

ট্যাক্সিওয়ালা তো হেসেই খুন। বললে—আরে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাতে কি, উঠে আসুন আমার গাড়িতে। দেখুন আপনাদের কতটা এগিয়ে দিই।

আমরা ইতস্তত করছি দেখে বললে—আর কিন্তু করবেন না। আমি তুপিঠের ভাড়াই পেয়ে গেছি।

এর উপর আর কি কথা চলে? আমরা সুড়-সুড় করে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা বললে—বাঁচলুম গল্প করবার তু্জন সঙ্গী পেয়ে। এতটা পথ একলা যেতে কি রকম লাগত বলুন তো?

আমরা বললুম—আমাদেরও কতটা উপকার হল সেটা দেখুন।

এক লাফে তিপ্পান্ন কিলোমিটার পথ পার হয়ে চলে এলুম আমরা একটা বনঘেরা পাহাড় পার হয়ে এক নদীর ধারে।

এই নদীর ধারে ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার একটু পরে আবার আমরা আর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম। আমরা ট্যাক্সি পেলুম বলা হয়তো ভুল হল, কারণ সেদিন ট্যাক্সিতেই আমাদের পেয়েছিল। যাই হোক, এটাতে করে যতই আমরা পশ্চিম-মুখো এগতে লাগলুম ততই বনের দৃশ্য আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। সুইডেনের পশ্চিম অংশে যেদিকে নরওয়ের সীমান্ত সেদিকে একটানা বনের রেখা চলে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। যত উত্তরে যাওয়া যাবে বনের প্রসার ততই বিস্তৃত। উত্তর-সুইডেনে মাইলের পর মাইল বন ছাড়া আর কিছুই নেই। অতি যত্নে দেশের এই বন-সম্পদ রক্ষা করা হয়।

আমাদের রাস্তা শেষ অবধি বনরাজ্যে প্রবেশ করল এবং ছোট্ট একটি পাহাড়ী গ্রামের ধারে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা চলে গেল। আমরা গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। হাঁটতে হাঁটতে কখন গ্রাম ছাড়িয়ে গেছি, বনের পথে কতদূর চলে এসেছি কিন্তু একটি গাড়িরও দেখা

পাই নি। মিরেক বললে—এ অঞ্চলে যে সহজে গাড়ি মিলবে তা আমার বিশ্বাস হয় না।

তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে—পেট করছে চোঁ-চোঁ। পিঠঝুলির খোপগুলো একেবারে খালি। গ্রামাঞ্চলে রাত কাটানোর ফলে পিঠ-ঝুলিতে কিছুই ভরা হয় নি। তার উপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বর্ষাতি বার করে গা-মাথা ঢেকে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে বনের মধ্যে একটা কুটিরের লাল ছাদ দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে লক্ষ্য করে খানিকটা চলে গিয়ে দেখলুম একটা উঁচু জমির উপর একটি সুন্দর কুটির। কুটিরের দরজা থেকে কাঁকর-ফেলা একটি বাঁকা রাস্তা আমাদের সামনে এসে শেষ হয়েছে—যেন হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে।

আমরা এক মুহূর্ত সেই রাস্তার ধারে দাঁড়ালুম। তারপর এগিয়ে গেলুম সেই কাঁকর-ফেলা পথ দিয়ে বাড়ির দরজার দিকে। দরজার মাথায় একটু আল্‌সের মতো। তারই তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাচ্ছি এমন সময় গৃহকর্ত্রী ভিতর থেকে দরজা খুললেন। দরজা খুলে ভিজে-কাকের মতো আমাদের দুটিকে দেখে তিনি একটু অবাক-ই হয়ে গেলেন। আমরা বললুম বৃষ্টির মধ্যে একটু আশ্রয় নিয়েছি।

কর্ত্রী বললেন—আসুন, আসুন রান্না ঘরে। সেখানে বেশ আগুন আছে।

পাহাড়ে জায়গায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের কাঁপুনি এসে গিয়েছিল। রান্নাঘরের উত্তাপের মধ্যে এসে আরাম পেলুম। তারপর মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বেশ চমৎকার ইংরেজী বলেন। জন্মেছেন রাশিয়ায়। বিয়ে করেছেন এক সুইডিশ বনরক্ষককে। সেই থেকে সুইডেনকেই দেশ করে নিয়েছেন।

—আজই সকালে আমার স্বামী বেরিয়েছেন বনের তদারকে। তিনি থাকলে আপনাদের দেখে খুব খুশী হতেন। তিনি বিদেশীদের বড্ড পছন্দ

করেন। আপনাদের কিছুতেই ছাড়তেন না, তাঁর গাড়ি করে তাঁর বনের আস্তানায় নিয়ে যেতেন অন্তত একটা রাতের জন্যে। সুইডেনের বন আপনারা দেখেছেন ?

আমরা বললুম—কিছু কিছু দেখেছি বৈকি, যে পথ দিয়ে এলুম সেই পথে।

—কোন পথ দিয়ে এলেন আপনারা ?

আমরা ম্যাপ ধরে দেখিয়ে দিলুম।

মহিলা বললেন—হায়, হায়, ওকি আবার বন হল ? ও তো একটু চললেই শেষ হয়ে যায়। বন হবে সমুদ্রের মতো, যার কোনো শেষ নেই। গাছের চূড়োয় চূড়োয় ঢেউ খেলে যাবে অপার জলের ঢেউয়ের মতো—তবে তো বলব বন। আসুন দেখে যান।

এই বলে বনরক্ষিণী রান্নাঘরের প্রকাণ্ড এক জানলার ধারে আমাদের দাঁড় করালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে আমরা বনের দৃশ্য দেখতে পেলুম। বৃষ্টি কেটে গিয়ে কুয়াশার জাল তখন সবে ছিঁড়তে আরম্ভ হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে দেখলুম নীল পাহাড়—সে কি ঘন নীল ! ঢেউ খেলানো সবুজ পাইনের শীর্ষ, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে শেষে ঐ নীল পাহাড়ে গিয়ে নীল হয়ে মিশেছে।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ বলে উঠলেন—আপনারা 'ওইএ' থেকে সোজা এখানে লাফা-যাত্রা করে এসেছেন—তার মানে আপনাদের এখনও কিছু খাওয়াই হয় নি। এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। দাঁড়ান এক মিনিট, কয়েকটা সসেজ ভেজে দি। এই বলে তিনি ক্ষিপ্রহস্তে আমাদের আহারের আয়োজনে লেগে গেলেন।

সসেজ ভাজতে ভাজতে বললেন—লাফা যাত্রী হয়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা, তাই সুইডেনের বনশোভা দেখতে পেলেন না।

আমরা বললুম—কেন, দেখতে পাবো না কেন ? বনের মধ্যে ঢুকলেই তো হল। বনের মধ্যে কি কোনো মোটার যায় না ?

—তা যায়। বনের মধ্যে দিয়ে ভাল ভাল রাস্তাও গিয়েছে প্রায়

চারিদিকেই। কিন্তু সেখান দিয়ে গাড়ির যাতায়াত খুব কম। লাফাযাত্রার বদলে হয়তো হাঁটতেই হবে সারাদিন।

আমরা বললুম—তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বনের মধ্যে গাছতলায় রাত কাটাতে হলে একটু মুস্কিলে পড়ব।

—বন-প্রদেশের একটি ভালো ম্যাপ থাকলে সে-ভয় নেই। গভীর বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁক আর যেখানেই ফাঁক সেখানেই ছোট্ট একটি গ্রাম। এই বনগাঁয়ের মানুষদের মতো প্রাণখোলা মানুষ সারা জগতে আপনারা পাবেন না। তাদের দেখলে মনে হয় জীবনে কোনোদিন তারা দুঃখ পায় নি, পাবেও না। বিদেশী অতিথি পেলে দুহাত বাড়িয়ে তারা নিজেদের গৃহে টেনে নিয়ে যাবে। অমন আপ্যায়ন, অমন হৃদ্যতা আপনারা শহরে বা গ্রামে কোথাও পাবেন না।

আমি বললুম—কিসে ওরা এত খুশী বলুন তো? বনের মধ্যে কি পায় ওরা?

বনরক্ষিণী বললেন—সেইটাই একটা রহস্য। কেউই জানে না বনের জীবনে ওরা কি পায়। ওরা নিজেরাই জানে না। কিন্তু বনের আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না। বনের আশেপাশে যে-সব গ্রাম—কাঠুরের গ্রাম, গোয়ালার গ্রাম, চাষীদের গ্রাম, সেখানকারও মানুষরা বনের টানে পাগল। গ্রীষ্মের প্রভাতে যেদিন আকাশ হঠাৎ নীল হয়ে ওঠে, সেদিন কাউকে আর বলে দিতে হয় না। বনাঞ্চলের গ্রামীলরাও হঠাৎ যেন মন্ত্রচালিত হয়ে ওঠে। দেখা যায়, গরু আর ভেড়া নিয়ে গ্রামের মেয়েরা কোথায় যাবে বলে বেরিয়ে পড়েছে। সূর্য যত উঠতে থাকে বনপ্রান্তের প্রতি গ্রামে প্রতি গোলাঘরে কিসের যেন চঞ্চলতা দেখা দেয়। সবাই একে একে বেরিয়ে পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গাড়িতে ঘোড়া জোতা হয়; তাতে বোঝাই হয় রুটি, মাখন, পনির, মাংস, ফল। সেই গাড়ির সঙ্গে চলে কেউ কেউ। কেউ যায় আগে, কেউ পরে। ক্রমে দেখা যায় চারিদিকের যত গ্রামীল আছে সবাই গ্রামের পথ ছেড়ে বনের পথ ধরেছে। সারাদিন বনের পাকদণ্ডি দিয়ে

ঘুরে ঘুরে সবাই উঠতে থাকে। তারপর বিকেলে সূর্যের সোনালী আলো যখন লম্বা লম্বা ছায়া ফেলতে শুরু করেছে, সেই সময় একটি দুটি করে দল চারিদিক থেকে এসে জুটতে থাকে বনের মধ্যিখানে একটা খোলা জায়গায়। সেখানে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে গড়া খান-দুই কুটির আর গরু রাখবার চালাঘর আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। এখানে এ-গ্রামের লোকের সঙ্গে ও-গ্রামের বাসিন্দাদের দেখা হয়, কথা হয়, হাসি হয়, গল্প হয়। গোয়ালিনীরা গরুদের কচি ঘাস এনে খেতে দেয়। গরুদের আনন্দস্বরে বনাঙ্গন ভরে ওঠে। তারপর কেউ জল নিয়ে আসে, কেউ কাঠ নিয়ে আসে। রান্না-বান্না হয়; পাথরের উপর ঘাসের উপর বসে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যায়। গ্রীষ্মের রাতে আকাশে যতক্ষণ আলো থাকে কেউ ঘুমোতে যেতে চায় না। সকলে গোল হয়ে বসে। গোয়ালিনীরা তাদের ছুঁচের কাজ করতে আর পুরুষরা গল্প বলতে কিংবা গান করতে থাকে।

আমরা বললুম—বাঃ, কথা দিয়ে আপনি খুব চমৎকার চিত্র আঁকতে পারেন।

বনরক্ষিণী বললেন—আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে চিত্র। কিন্তু আমরা বনের মানুষ, আমাদের ঐ হচ্ছে বাস্তব। গরু চরানো, ঘাস কাটা, বন্য ফল সংগ্রহ, কাঠের জ্বালে রান্না, ছুঁচের কাজ, আর গাল-গল্প গান-নাচ এর বাইরে আমরা যাইও না, যেতে চাইও না।

আমরা বললুম—আমাদের 'প্রোগ্রাম' হচ্ছে এখান থেকে যত শীঘ্র পারি অসলো পৌঁছানো। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একবার সুইডেনের অরণ্যের মধ্যে ঢু঳ মেরে গেলে হয়।

সসেজ রান্না হয়ে গিয়েছিল। বনরক্ষিণী পরিবেশন করতে করতে বললেন—আমার পক্ষে আপনাদের মতো বিদেশী উৎসাহী যাত্রীদের অরণ্যে প্রবেশ করবার উপদেশ দেওয়া উচিত হবে না। দিনকতক আগে আমার এই বাড়িতে একটি ডেনিশ লাফা-যাত্রী এক রাতের জন্যে অতিথি হয়েছিল। আমার স্বামী তাকে বনের পথ থেকে তুলে তাঁর গাড়ি করে এখানে নিয়ে

আসেন। ছেলেটি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে তিন রাত ঘুরেছে, কোথাও আস্তানা পায় নি। ঘুরেছে মাইল দশেক ব্যাসের একটি ছোট জায়গায় বৃত্তের আকারে। অথচ সেই বনাংশের চারিদিকেই চমৎকার সুন্দর সুন্দর গ্রাম। ছেলেটি যদি যে-কোনো একদিকে সোজা হাঁটতো, সূর্যের স্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে, তা হলে অতি সহজেই সে যে-কোনো একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছত। তিনদিন তিন রাত এইভাবে ঘোরার ফলে তার যা চেহারা হয়েছিল, দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

মিরেক আর আমি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলুম—আচ্ছা এই ছেলেটির কি পায়ে স্যাণ্ডেল? লম্বা লম্বা চুল?

মহিলা বললেন—ঠিক তাই। আপনারা চেনেন নাকি? সে বললে, সে নাকি মনে মনে কবিতা রচনা করছিল, তাই কোন দিকে চলেছে খেয়াল করতে পারে নি।

আমরা বললুম—তিনদিন তিন রাত শুধু কবিতা ভেবেছে?

মহিলা হেসে বললেন—আমরা জানতে চেয়েছিলুম, কি কবিতা সে লিখেছে সুইডেনের বন সম্বন্ধে। বললে, সমস্ত মাথার মধ্যে আছে, দেশে ফিরেই লিখে ফেলবে। তখন সে দেশে ফিরতে ভয়ানক ব্যস্ত। এখানে আর দু একদিন থাকতে বলেছিলুম, রইল না।

আমরা বললুম—এই কবিটির সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। আমরা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম।

বনরক্ষিণী বললেন—ঐ জন্যেই কাউকে একা বনের মধ্যে যেতে বলতে আমি ইতস্তত করি।

আমরা হেসে বললুম—এ যাত্রায় আমরা চললুম ভার্মল্যাণ্ডের দিকে। কিন্তু এর পরের বার নিশ্চয় সুইডেনের বন দেখব। ভয় নেই, বনের পথে চলতে চলতে কবিতা লেখবার তাগিদ আমাদের আসবে না।

১০ ॥

বিদায় নিয়ে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। বৃষ্টির পর বনভূমি সুশ্যামল হয়ে উঠেছে। সব যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার। বৃষ্টির পর রোদ উঠলে যেমন হয়ে থাকে, বনের গা থেকে একটা হালকা বাষ্প উঠছে আকাশে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বাতাস যেন স্ফটিকের মতো। ঝরা পাইন-পাতায় ঢাকা ভিজে মাটির উপর পা ফেলে আমরা চলতে শুরু করলুম।

বনের পথে মাইল খানেক হাঁটবার পর একটা গাড়ি পেয়ে গেলুম। তাইতে করে বন পার হয়ে এসে পৌছলুম আমরা আবার এক নদীর ধারে। এর পর লাফা-যাত্রা বেশ ভালই চলতে লাগল। শীঘ্রই আমরা 'ভার্মল্যাণ্ড' প্রদেশে এসে প্রবেশ করলুম। ভার্মল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে 'ক্লার-অ্যালভেন' নদী বহে গিয়ে পড়েছে সুইডেনের বৃহত্তম হ্রদ 'ভ্যানার্ন'-এ। এই নদীর উপত্যকা ভারি উর্বর। সুইডেনের বহু পুরাতন রাজন্য এবং জমিদারবংশ এই উপত্যকার চারিদিক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সুইডিশ সাহিত্যে এদের কথা পড়েছিলুম, ভুলেও গিয়েছিলুম। ভার্মল্যাণ্ডে প্রবেশ করে ভাসা-ভাসা মনে পড়তে লাগল। ম্যাপে দেখলুম ভার্মল্যাণ্ডের মাঝখানে ক্লার-অ্যালভেন নদীর সমান্তরাল একটি হ্রদ—চওড়া মাত্র আধমাইল কিন্তু লম্বা প্রায় চল্লিশ মাইল—এরই ঠিক মাঝখানে 'সুন্নে' গ্রামে আমাদের একটি য়ুথ হস্টেল আছে।

ঠিক সন্ধ্যার আগেই একটা গাড়ি থামালুম। এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী যাচ্ছিলেন 'সুন্নে' গ্রাম পর্যন্ত; তাঁরা আমাদের য়ুথ হস্টেলের দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। যাবার আগে তাঁরা বলে গেলেন, এই সুন্নে গ্রাম সুইডেনের বিখ্যাত লেখিকা 'সেল্‌মা লেগারলফ্‌'এর জন্মস্থান। যে বাড়িতে তিনি জন্মে-ছিলেন সেই 'মারবাকা'-গৃহ তাঁর বাবার আমলে বিক্রি হয়ে যায়। এতদিন পরে বৃদ্ধা-বয়সে সেল্‌মা আবার তাঁর পুরোনো বাড়ি 'মারবাকা'-কে ফিরে পেয়েছেন এবং এখানেই আজকাল থাকেন।

আমরা হস্টেলে নেমেই খোঁজ নিলুম সেল্‌মা লেগারলফ আছেন কি না এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে কি না? শুনলুম কয়েকদিন হল তিনি নরওয়েতে বেড়াতে গেছেন। আপাতত সেখানেই।

গোধূলির আলোয় শান্ত 'ফ্রিকেন' হ্রদের ধারে য়ুথ হস্টেলের দোতালার খোলা বারান্দায় বসে চারিদিকের ক্ষেত-খামার রাস্তাঘাটের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মন কেমন যেন ঘর-মুখো হয়ে উঠল। এতদিন ধরে যে-সব য়ুথ হস্টেলে গিয়ে উঠেছি, সেখানে সব সময় প্ল্যান করেছি কাল সকালে কোথায় কোন পথে কতদূর যাওয়া যায়। এই প্রথম এ-জায়গাটা থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার কথা মনে জাগল না। বরং মনে হল এই নিবিড়তার মধ্যে চুপটি করে বসে থাকি, ঘরের মানুষের মতো যতক্ষণ পর্যন্ত না আলস্যে মন ভরে আসে। এখানকার সবই যেন কেমন একটু অন্যরকম। সব চেয়ে অন্যরকম হচ্ছে হ্রদটা। হ্রদ বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন কার বাগানবাড়ির ঝিল। মনে হয় এই ঝিলের ধারেই জীবনের সব কিছু আনন্দ, সব কিছু উত্তেজনা। এর বাইরে আর কিছু নেই, বাইরে যাবার প্রয়োজনই নেই। মনে হয়, তাই তো? সেল্‌মা লেগারলফ সারা ইয়োরোপ ঘুরে তবে কি এরই টানে শেষ জীবনে ফিরে এসেছেন এই জায়গাটিতে?

মিরেককে বললুম—মিরেক কেমন লাগছে তোমার এই জায়গাটা? আমার যেন কেমন আর নড়তে ইচ্ছে করছে না।

মিরেক কিছু বলবার আগেই একটি জার্মান ছেলে এসে আমাদের জার্মান ভাষায় সাম্বোধন করে বললে—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম।

—বসুন একটা চেয়ার টেনে।

আলাপ-পরিচয় হল। ছেলেটি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিতে বিদেশ দেখতে বেরিয়েছে লাফা-যাত্রা করে। জার্মানী, ডেনমার্ক ও সুইডেন-এ এর মধ্যেই তার দেড় হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে। পকেট থেকে তার দিনপঞ্জী খুলে আমাদের দেখিয়ে দিলে, গত আড়াই সপ্তাহে কবে কত কিলোমিটার পথ সে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে এসেছে এবং তার

যোগফলই বা কত। আরো আড়াই সপ্তাহের মধ্যে তার আরো দেড় হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা চাই। সবসুদ্ধ তিন হাজার না হলে তার মন উঠবে না।

—আপনাদের কত কিলোমিটার হল?

মিরেক বা আমি কেউই কিলোমিটার বা মাইলের হিসেব রাখি নি। রাখবার প্রয়োজনও বোধ করি নি। কাজেই আমরা কোনো সদুত্তর দিতে পারলুম না।

তখন জার্মান ছেলেটি বললে—কিন্তু আমার কি মুশকিল হয়েছে জানেন? এত দেশ ঘুরেছি, কোথাও এক লহমাও থামি নি। ভোর থেকে লাফা-যাত্রা আরম্ভ, রাতের অন্ধকার নামলে তবে শেষ। কিন্তু এই জায়গাটায়, এই স্থুন্নে গ্রামে এসে আটকে গেছি। এখানে কি আছে জানি না—যেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসে, চারিদিক এমন স্নিগ্ধ হয়ে যায়, মনের উপর কিসের একটা স্পর্শ পাই। মনে হয় আর একটা দিন এখানে এমনি করে কাটাই। এই করে করে আমার তিন দিন এখানে কেটেছে। কি করে আমার এখন তিন-হাজার কিলোমিটার পুরো হয় বলুন তো?

আমি বললুম—সর্বনাশ, তা হলে তো আপনার এখানে আর এক মূহূর্ত থাকা চলে না। কালই ভোরে বেরিয়ে পড়ুন, নইলে শেষে দেখবেন তিন হাজার কেন, দু হাজারও আপনার হয়ে উঠবে না।

জার্মান ছেলেটি বললে—ঠাট্টা করছেন? আচ্ছা আপনারাও তো নানা জায়গায় ঘুরছেন। হ্রদটির দিকে একবার তাকান। বলুন তো ফ্রিকেন হ্রদস্থিত স্থুন্নের মতো এমন জায়গা কোথাও দেখেছেন?

আমি বললুম—এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমরা একেবারে একমত। আপনি আসবার ঠিক আগেই আমার বন্ধুর সঙ্গে এই আলোচনাই হচ্ছিল। আমি বলছিলুম, এত জায়গায় এত ছুটোছুটি করে এসে ঠিক এখানটিতেই এমনভাবে চুপচাপ বসে পড়তে ইচ্ছে করছে কেন?

জার্মান ছেলেটি বললে—শুধু 'স্থুন্নে' নয়, 'ক্লার-অ্যালভেন' উপত্যকার

সমস্ত উত্তরাংশটাই এই রকম। হয়তো সমস্ত ভার্মল্যাণ্ডই, কে জানে? আমি এই তিনদিন এই উপত্যকায় খুব ঘুরেছি। এখানকার গোলাবাড়ি জমিদারবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এখানকার পুরোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে অনেক গল্প করেছি। আমার ধারণা এখানকার মাটির আকর্ষণে যারা একবার এখানে এসেছিল তারা আর নড়তে চায় নি। বংশের পর বংশ কাটিয়ে গেছে, আর সমস্ত উপত্যকা নিয়ে একটা বৃহৎ পরিবারের মতো গড়ে উঠেছে। যতদিন এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা জমিদার আর চাষীর হাতে ছিল ততদিন অপুর্ব একটা সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছিল চারিদিকে। আজকালকার এই কলকারখানার যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয়ে গেছে ছাড়া-ছাড়া। ক্লার-অ্যালভেনেরই তীরে 'মুক্কফোর্স'-এর লোহার কারখানায় যান, সেখানেই দেখবেন আর এক দৃশ্য—কেউ যেন কারুর নয়। একমাত্র ফ্রিকেন হ্রদের তীরেই দেখছি সেই বিগত দিনের সুসামঞ্জস্য, যা এখানকার সব মানুষকে যেন এক পরিবারভুক্ত করে রেখেছিল তারই স্পর্শ হাওয়ায় হাওয়ায় মাটিতে মাটিতে লেগে রয়েছে।

আমি বললুম—আপনার বিশ্লেষণ চমৎকার।

ছেলেটি বলে চলল—এখানকার পুরোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে আমি অনেক গল্প করেছি—তাদের কাছ থেকেই পুরোনো দিনের একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। বুড়োরা যখন তাদের হারানো দিনের কথা বলে, তা শুনে হৃদয়ে সাড়া না জেগে পারে না। বেশ বোঝা যায়, তাদের তখনকার সহজ জীবনযাত্রায় তারা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সুখী ছিল।

—ঐ যে রাস্তা চলে গিয়েছে বন অবধি, শুনেছি তার দুপাশে ছিল আলুর ক্ষেত। ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে চাষী আর চাষীবৌরা আলু জমা করতো সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। গ্রীষ্মের শেষে এই দৃশ্য। আপেল গাছ, ন্যাসপাতি গাছ, পীচ, প্লাম, নানারকম 'বেরি'র গাছ ফলে ফলে ফলন্ত। এত ফল, যে খেয়ে গ্রামের লোক শেষ করতে পারবে না। তাই সবাই

ব্যস্ত পাকা ফলগুলি পেড়ে চিনির রসে ফুটিয়ে শীতের জন্যে জমা করে রাখতে। ঘরে ঘরে চিনির রসের সুবাস উঠতো। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আলমারির মাথা ফল-ভরা বুয়ামে ভরে উঠত। আলু কেটে শুকোতে দেওয়া হতো—পিষে ময়দা হবে। শীতের জন্যে খাদ্য সঞ্চয়ের কাজে কারুর আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকত না। এই কাজ শেষ হতে না হতেই শন বাছাই-এর সময় এসে পড়ত। শন কাটা, শুকোনো, তারপর ঝাড়াই করা। গ্রামের জমিদারবাড়ির উঠোনে গ্রাম-সুদ্ধ মেয়েরা শন পেটাবার জন্যে হাজির হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পিটিয়ে পিটিয়ে শনের সুতো বার করা, সে কি কম পরিশ্রম? মেয়েদের পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শনের ফেঁসোয় শাদা হয়ে যেত তবু সমানে চলত তাদের হাসি আর গান। বছরের প্রতিটি দিন কেটে যেত কাজের স্রোতের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে ছুটির উৎসব—যেমন বড়দিন, ঈস্টার, কিংবা স্থানীয় মেলা। এইসব উৎসবের জন্যেই বা কত আগ্রহ, কত প্রতীক্ষা, কত আয়োজন, কত কথা! বুড়োদের মুখে শুনতে শুনতে আমারই ইচ্ছে হয়, যাই ফিরে সেই অতীতের দিনে—

আমি বললুম—আপনার যখন জায়গাটা এতই ভাল লেগেছে, থেকে যান না আরো কয়েকটা দিন।

ছেলেটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—না না, না, তাহলে আমার তিন হাজার কিলোমিটারের কি হবে? কাল ভোরেই আমি বেরোচ্ছি এখান থেকে—কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না।

আমরা বললুম—বসুন বসুন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমাদের এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিয়ে যান? আপনি যেমন পারবেন তেমন আর কেউ পারবে না। এতদিন রইলেন, কালকের দিনটা আমাদের নিয়ে একটু ঘুরুন—পরিচয় করিয়ে দিন জায়গাটার সঙ্গে। তারপর সকলে মিলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাবে লাফা-যাত্রায়।

জার্মান ছেলেটি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে আমাদের

প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল কাল সকালে আমাদের নিয়ে সে আশেপাশে ঘুরবে।

তারপর দিন সমস্ত সকালটা স্বন্নে গ্রামে এবং তার আশপাশের দু একটা গ্রামে আমরা ঘুরলুম। গোলাবাড়ি দেখলুম, জমিদারবাড়ি দেখলুম, প্রাণখোলা বুড়ো চাষীদের সঙ্গে গল্প করলুম, তাদের দেওয়া চাষাড়ে রুটি আর মধু খেলুম এবং শেষে যখন দুপুর হয়ে গেল তখন জার্মান ছেলেটির হঠাৎ তিন হাজার কিলোমিটারের কথা মনে পড়ে গেল। সে বললে—আর নয়, বাঁধো এইবার পিঠঝুলি পিঠে। বেরিয়ে পড়ি আমরা যে-যার দিকে।

ঠিক হল আমরা দুজনে একটু এগিয়ে যাবো, জার্মান ছেলেটি পিছনে থাকবে যাতে প্রথম গাড়িটা সে পায়। এই ব্যবস্থা করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম আবার লাফা-যাত্রায়। মাইলখানেক হেঁটেছি, এমন সময় গাড়ির আওয়াজে পিছন ফিরে দেখি, এক যাত্রী-বোঝাই গাড়িতে আমাদের পরিচালক এবং বন্ধু জার্মান ছাত্রটি হাত নেড়ে বিদায় জানাতে জানাতে চলেছেন।

আমরাও শীঘ্রই একটা লরি পেয়ে গেলুম—আবার আমাদের লাফা-যাত্রা শুরু হল। সেদিন অর্ধেকটা দিন স্বন্নেতেই কেটে গিয়েছিল, তাই খুব বেশি দূর এগতে পারলুম না। দিনের শেষে আমরা এসে পৌছলুম 'ভ্যানার্ন' হ্রদের উত্তরে 'কার্লস্টাড' শহরে।

পরদিন 'কার্লস্টাড' শহর থেকে বেরলুম আমরা সোজা 'অস্‌লো'র উদ্দেশে। প্রথমে একটা লরি, তারপর একটা লোহা-বোঝাই লরি, তারপর এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়ি সারিয়ে 'টেস্ট্' করতে যাচ্ছিলেন, তাঁর গাড়িটা, তৎপরে এক ভদ্রলোক যিনি কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন এবং আমেরিকান ছাঁদে ইংরেজী বলতে শিখেছেন, তাঁর গাড়ি এবং তারপর একখানা গাড়ির শুধু 'শ্যাশি'টা চলেছে তাকে থামিয়ে তাইতেই কোনরকমে ঝুলতে ঝুলতে আমরা প্রায় নরওয়ের সীমান্তের কাছাকাছি এসে পৌছলুম। তখন বিকেল হয়েছে, সূর্য

ডুবু ডুবু। এর পর সন্ধ্যে পর্যন্ত আর কোনো গাড়িই পাওয়া গেল না। শেষে যখন দেখলুম সেদিন আর অস্‌লো পৌছবার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং কোথায় রাত কাটানো যায় তাই চিন্তা করতে শুরু করেছি, ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে কোথা থেকে একখানা গাড়ি এসে গেল। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে অস্‌লো ফিরে যাচ্ছেন। বহুদূর থেকে আসছেন তাঁরা, সকলেই বেশ ক্লান্ত, তবু বললেন—উঠে পড়ুন, পৌছে দি।

অস্‌লো তখনো বহুদূর। হিসেব করে দেখা গেল, রাত বারোটার আগে কোন-ক্রমেই সেখানে পৌছান যাবে না। আমরা তাই ভেবে বললুম—আপনাদেরও কষ্ট হবে, আমাদেরও কষ্ট হবে। আজ বরং আমাদের সুইডেন-নরওয়ের সীমান্ত-শহর 'টক্সফোর্স'এ নামিয়ে দিন। এখানে একটি যুথ হষ্টেল আছে।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ তবে এই নিন আমার অস্‌লোর ঠিকানা। অস্‌লোয় পৌছেই কিন্তু আমাদের খবর দেবেন এবং আমার বাড়িকে মনে করবেন আপনাদের নিজেদের বাড়ি।

নরওয়েতে ঢুকতে না ঢুকতেই নরওয়ের আতিথেয়তার স্বরূপ দেখে আমরা চমৎকৃত হলুম। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে সীমান্ত-শহর 'টক্সফোর্স'এ পৌছে সেদিনের মতো আশ্রয় নিলুম আমাদের যুথ হস্টেলে।

তারপর দিন আরম্ভ হল আমাদের নরওয়ের অভিযান। টক্স্‌ফোর্স থেকে কয়েক মাইল দূরে নরওয়ের সীমান্তরেখা। সেখানে আমাদের পাসপোর্ট দেখিয়ে পাসপোর্টে ছাপ নিয়ে আমরা নরওয়ের মাটিতে পা দিলুম।

নরওয়েতে প্রবেশ করবার একটু পরেই আমরা টের পেয়ে গেলুম যে, মোটার গাড়ির সংখ্যা এখানে সুইডেনের চেয়ে কম। সকালের দিকে সাধারণত আমাদের গাড়ির জন্যে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। আজ আমরা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটলুম কিন্তু কোনো গাড়ির চিহ্ন নেই। তারপর পেলুম একটা গাড়ি আকস্মিকভাবে। চলবার সময় আমাদের কান থাকে পিছনের দিকে। পিছন থেকে কি শব্দ আসছে তাই শুনতেই লাফা-যাত্রী সব সময়

উৎকীর্ণ। মিরেক ঠাট্টা করে বলে—লাফা-যাত্রীর চোখও থাকে সব সময় পিছনের দিকে। সেদিন প্রমাণ পেলুম যে মিরেক কিছু মিছে বলে নি। কারণ আমাদের ঠিক সামনেই যে বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ তাঁর মোটারে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বা তাঁর গাড়িকে আমরা দুজনে কেউ লক্ষ্যই করি নি। হাঁটতে হাঁটতে সবে আমরা গাড়িটাকে পেরিয়ে গেছি, তখন চোখে পড়ল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম। বৃদ্ধটি ঘাড় তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—কতদূর যাবেন ?

—অস্‌লো।

—অতদূর পারবো না, তবে খানিকটা নিয়ে যেতে পারি। পিঠঝুলি দুটো রাখুন দেখি গাড়ির মধ্যে। রেখে দুজনে মিলে দিন একটা ঠেলা।

ঠেলা দিতে গাড়ি স্টার্ট হল। বৃদ্ধ বললেন—পথে কিন্তু এক বস্তা আলু তুলে নেব। আপত্তি নেই তো ?

—কিছু না, কিছু না, তুলুন না যত খুশি।

পথের এক জায়গা থেকে বিরাট এক বোঝা আলু উঠল। তার ভারে গাড়ির একদিক হয়ে গেল কাত। মিরেক বললে—এত আলু নিয়ে কি করবেন ?

—বিক্রী করব, আমার দোকান আছে। নানা গ্রাম থেকে আমি আলু, পেঁয়াজ, ডিম, মাখন প্রভৃতি এই গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যাই।

আমি বললুম—নরওয়েতে লাফা-যাত্রা কিরকম চলে ?

বৃদ্ধ আমাদের অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—লাফা-যাত্রা ? সে আবার কি ?

আমরা রীতিমত ঘাবড়ে গেলুম। প্রথমটা ভাবলুম, বোধ হয় ঠাট্টা করছেন। তারপর দেখলুম, তিনি সত্যিই জানেন না।

মিরেক তখন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললে, এইভাবেই আমরা স্টকহল্‌ম্ থেকে আসছি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং বললেন, আমার এত বয়স হল, এইভাবে পরের গাড়ি করে লাফিয়ে লাফিয়ে যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া যায়, এ আমি কখনো শুনি নি। আমি

ভেবেছিলুম, আপনারা বুঝি পায়ে হেঁটে চলেছেন অস্‌লো—তাই একটু আশ্চর্য লাগছিল। আপনাদের মতো এইরকম লাফা-যাত্রী পৃথিবীতে আর ক'টি আছে?

আমরা বললুম—গ্রীষ্মের সময় ইয়োরোপের যে-রাস্তাতেই মোটার চলে সেই রাস্তায় লাফা-যাত্রীও চলে। আপনার গাড়ি আজ অবধি কেউই কি হাত দেখিয়ে থামাবার চেষ্টা করে নি?

—আমি আজ এক বছরের উপর এই গাড়িটা কিনে ব্যবহার করছি। পুরোনো হলেও গাড়িটা তো নেহাত ফেলনা নয়, আর আমি এটাকে ঝক্‌ঝকে করে রাখতে কম যত্নও নিই না। অথচ ঐ আপনারা যাকে বলেন 'লাফা-যাত্রী' তারা যে কেন আমার গাড়ি পছন্দ করে না বুঝতেই পারছি না।

আমরা বললুম—ভাববেন না। আমরা বউনি করে দিয়ে গেলুম, এইবার থেকে দেখবেন দলে দলে লাফা-যাত্রী আপনার গাড়িকে ঘিরে ধরবে।

এইভাবে গল্প করতে করতে সেই বৃদ্ধের গ্রামের কাছে এসে আমরা হাজির হলুম। তিনি গ্রামের সীমানার বাইরে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে গেলেন।

এর পর একটার পর একটা লরি। পর পর চারটে লরি আমাদের কপালে জুটল। লরির সীট শক্ত; প্রাইভেট গাড়ির মতো গদি বসানো নয়। লরির স্প্রীং-ও কড়া। কিন্তু লরিতে চড়তে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। বরং লরি চড়েই আমরা বেশি আনন্দ পেতুম। প্রাইভেট মোটারের চালকেরা কেউ কেউ যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছেন, আলাপ করেছেন, গল্প করেছেন; কেউ কেউ আবার মুখ বুজে গাড়ি চালিয়েছেন, কেউ কেউ কৃপার ভাবও প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আজ অবধি কোনো লরিওয়ালা অকৃত্রিম হৃদ্যতা ছাড়া আর কোনো ভাবই প্রকাশ করে নি। এইজন্যে লরিওয়ালাদের আমরা পছন্দ করতুম।

চতুর্থ লরিটা আসছিল পাথর বোঝাই হয়ে। আমাদের হাত তোলা দেখে থামল। পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে লরিওয়ালা দেখল একটুও জায়গা

নেই। তখন নিজেই উঠল পিছনে। উঠে কয়েক চাংড়া পাথর রাস্তার এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের ডাকল—উঠে আসুন, জায়গা হয়ে গেছে।

আমরা তার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। বললুম—পাথরগুলোর কি হবে ?

লরিওয়ালা বললে—কোন চিন্তা নেই। আবার পাথর নিতে আসছি এ পথে, সেই সময় তুলে নেব।

এইভাবে ক্রমেই আমরা অস্‌লোর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। শেষে একটা নতুন ঝক্‌ঝকে গাড়ি পেয়ে গেলুম। সেই চমৎকার মোটারে চড়ে ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে আমরা প্রবেশ করলুম অস্‌লো শহরে। শহরে ঢোকবার আগে শহরতলীতে দেখলুম অস্‌লোর ফিয়োর্ড-এ বহু স্নানার্থীর ভিড়। খটখটে দিন দেখে সবাই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ফিয়োর্ড-এর জলে গা ভাসাবার নেশায়। নরওয়ে-সুইডেনের চারিদিকেই ফিয়োর্ড, বিশেষ করে নরওয়েতে। সমুদ্র যেখানে জমির মধ্যে শরু পথ করে নিয়ে গভীরভাবে ঢুকে গেছে তাকেই বলা হয় 'ফিয়োর্ড'। এই ফিয়োর্ড-গুলির সৌন্দর্য, বিশেষত নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের সংকীর্ণ গভীর এবং মাইলের পর মাইল লম্বা ফিয়োর্ডগুলির সৌন্দর্য পৃথিবী-বিখ্যাত। প্রতি বছর নানা দেশ থেকে বহু যাত্রী এই দৃশ্য চোখে দেখবার জন্যে নরওয়েতে ভিড় করে আসে।

।। ১১ ।।

অস্‌লোতে এসে উঠলুম আমরা সেখানকার ওয়াই এম সি এর হোস্টেলে। আমার লণ্ডনের নরোয়েজিয়ান বন্ধু তুয়া তার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল।*, হোস্টেল থেকে তুয়ার মাকে টেলিফোন করলুম। জার্মান ভাষায় কথা হল। তিনি বললেন, এখনি চলে আসতে তাঁদের বাড়িতে। তুয়ার চিঠি

পেয়ে অবধি অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা তৈরি।

আমি বললুম—এখনি আসা তো হয় না। অস্লোতে আমাদের কিছু কাজ আছে। ম্যাপ কেনা, ভ্রমণ সমিতিতে গিয়ে খবর সংগ্রহ করা, ব্যাঙ্কের ঠিকানায় আগত দেশের এবং লণ্ডনের চিঠি আনতে যাওয়া প্রভৃতি কাজ। সেগুলো সেরে কাল যথাশীঘ্র পারি যাবো।

তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তিন-চার দিন তাঁর ওখানে থেকে যাওয়ার জন্যে। আমরা বললুম, শহরে বসে কাটাবার মতো সময় আমাদের একেবারেই নেই, তা ছাড়া শহুরে পোশাকও নেই। শেষে রফা হল, চব্বিশ ঘণ্টার মতো আমরা তাঁর বাড়িতে থাকব।

ওয়াই এম সি এর হোস্টেলে নানা দেশ থেকে নানা যাত্রী এসেছে। ইয়োরোপের প্রায় সব দেশেরই লোক। সবাই এসেছে নরওয়ে দেখতে, নরওয়ে ভ্রমণ করতে। তবে ভ্রমণ করার প্রথা বিচিত্র। কেউ কেটেছে রেলের সার্কুলার টিকিট। অস্লো থেকে আরম্ভ করে ট্রেনে চড়ে সারা নরওয়ে ঘুরে আবার অস্লোতে ফিরে আসা। কেউ আবার এরই সঙ্গে খানিকটা বাস-ভ্রমণ, স্টীমার-ভ্রমণ জুড়ে দিয়ে জিনিসটাকে রঙীনতর করবার চেষ্টা করেছে। একদল চলেছে পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। কেউ সঙ্গে করে নিজের মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। আর একদল আছে সাইক্লিস্ট। আমাদের মতো লাফা-যাত্রী খুব কমই দেখলুম।

খাবার টেবিলে একটি ইংরেজ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। সে এসেছে ইংলণ্ড থেকে তার সাইকেল নিয়ে। তাইতে চড়ে নরওয়ে দেখবে। আপাতত চলেছে য়োটুনহাইম পর্বতাঞ্চলে। সেখানে পৌছে আমাদেরই মতো পিঠঝুলি পিঠে হাঁটবে। যখন শুনলে, আমরা লাফা-যাত্রা করে সেখানে পৌছতে চাই, সে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—এ-ও কি সম্ভব?

মিরেক বললে—কেন নয়? এইতো আমরা স্টকহলম থেকে অস্লো অবধি লাফা-যাত্রা করে এলুম।

ছেলেটি একটু ভাবলে, তারপর হেসে বললে—সুইডেনের মোটর চালকেরা তাহলে অত্যন্ত পরোপকারী।

আমরা বললুম—এটা কিন্তু আপনার নরওয়ের প্রতি খুব অবিচার করা হল। আপনার এখন উচিত, সাইকেলটা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে য়োটুনহাইম পর্যন্ত লাফা-যাত্রা করা। তবেই বুঝতে পারবেন নরোঈজানরাও সুইডিশদের চেয়ে কম পরোপকারী নয়।

ছেলেটি বললে—তাহলে সত্যি কথা বলি। আমা-দ্বারা লাফা-যাত্রা হবে না। পরের গাড়ি থামাতে আমার মাথা কাটা যাবে। হাতই উঠবে না।

ইংরেজ ছেলেরা লাজুক হয় জানতুম। তাই আর বেশি ঘাঁটালুম না। বললুম—বেশ, তবে আপনার সাইকেল-যাত্রাই সুখের হোক। আশা করি, য়োটুনহাইম পর্বতে দেখা হবে।

তার পরদিন আমরা যাত্রার আনুষঙ্গিক কাজ সারবার জন্যে ট্রামে করে শহরের মধ্যস্থলে চললুম। ছোটোখাটো নানা রকমের কাজ ছিল। মিরেক আর আমি কফিখানায় বসে নিজের নিজের দেশে চিঠিই লিখলুম প্রায় গোটা কুড়ি। সব কাজ সারতে দিন শেষ হয়ে গেল। বিকেল বেলা শহরের একপ্রান্তে তুয়ার মার কাছে গিয়ে যখন পৌছলুম, তিনি বললেন—ভালই হল, বিকেল বেলা এসেছ, তাহলে দুটো রাত এখানে কাটিয়ে যেতে পারবে।

আমি বললুল—কি রকম? চব্বিশ ঘণ্টার কড়ারে তো আসা।

তুয়ার মা আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন—চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হতে-হতে কাল বিকেল হয়ে যাবে। তখন আর যাবে কোথায়? ট্রামে করে শহর পার হতে-হতেই তো সন্ধ্যে। সন্ধ্যাবেলায় কি লাফা-যাত্রা শুরু করতে চাও নাকি?

ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াবে, তা আমরা ভেবে দেখি নি। কাজেই এ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোনো কথা চলল না। আমরা মেনে নিলুম, আমরা দু' রাতই

সেখানে থাকব। তুয়ার ভাই 'পেয়ার' আর বোন 'আস্ত্রি'র সঙ্গে তখনই আমাদের আলাপ জমে গেল। পেয়ার অস্‌লোয় কলেজে পড়ে, ইংরেজী শিখেছে। আস্ত্রির বয়েস নয়—সে মাতৃভাষা ছাড়া কিছুই জানে না। কিন্তু তার প্রশ্ন অনেক জমা হয়েছে। ভারতবর্ষ আর চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানতে চায়। পেয়ার হল আমাদের দোভাষী। তর্জমার সাহায্যে আস্ত্রির অগণিত প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে রাত হয়ে গেল। তুয়ার মা যখন এসে আমাদের সকলকে খেতে ডাকলেন, তখন আস্ত্রির চতুর্বিংশ প্রশ্নের উত্তরে আমি রামায়ণের গল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি।

আস্ত্রির মা জিগ্যেস করলেন—হ্যাঁরে, তুই এত প্রশ্ন কোথা থেকে জোগাড় করলি রে?

নির্বিকারভাবে আস্ত্রি জবাব দিলে—কেন, স্কুলের দিদিমণিদের কাছ থেকে। সবার কাছ থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন আদায় করেছি। এই দেখ না। বলে তার ছোট্ট খাতাখানা বার করে দেখালে।

আস্ত্রির মা বললেন—তোর প্রশ্নের চোটে যে তোর অতিথিরা গলদঘর্ম। এবার ওদের রেহাই দে।

আস্ত্রি বললে—আর তিনটে মাত্র বাকি। তা হলেই শেষ।

আমি তখন বালী আর সুগ্রীবের লড়াই পর্যন্ত এসে পৌচেছি। কাজেই ঠিক হল রামায়ণের গল্প এবং বাকী তিনটে প্রশ্নের উত্তর কাল দেওয়া যাবে।

তার পরদিন পেয়ার আমাদের সঙ্গে করে অস্‌লোর নানা জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল। অস্‌লো ছোট্ট শহর—একদিকে তার পাহাড়, অন্য দিকে ফিয়োর্ড-এর নীল জল। এত সুন্দর রাজধানী ইয়োরোপের আর কোথাও আমরা দেখি নি। নরোঈজানরা তাদের প্রধান শহর অস্‌লোকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। পেয়ার বললে—তার বাবা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে ঘুরেছিলেন। তিনি বরাবর বলতেন, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে গেছেন যে, অস্‌লোতে যে একবার জন্মেছে, তার কাছে অস্‌লো যেমন শহর তার জুড়ি আর কোথাও থাকতে পারে না।

পেয়ার বললে—আমিও ঘুরব একদিন হয়তো পৃথিবী। দেখব সেদিন বাবার কথাটা কত সত্যি।

মিরেক আর আমি দুজনেই আমাদের উভয়ের রাজধানীর উল্লেখ করে বললুম—আমাদের অতিথি হতে ভুলো না। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে আমাদের প্রধান শহর তোমার প্রধান শহরের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় রামায়ণের গল্প এবং আস্ত্রির শেষ তিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাদের কর্তব্য সমাধা হল। তুয়ার মা চমৎকার রেঁধে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর অস্লোর ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে সকলে একসঙ্গে সই করে তুয়াকে লণ্ডনে পাঠানো হল।

পরদিন সকালে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে পিঠঝুলি পিঠে নিতে গিয়ে দেখি বিষম ভারি ঠেকছে। কি ব্যাপার? ফিতে খুলে দেখি, আরে সর্বনাশ—পিঠঝুলি যে একেবারে কেক্-এ আর নীল প্লাম-এ ঠাসা। তোলাই যায় না। কাল তুয়ার মার তৈরি কেক্ আর তাঁর বাগানের নীল প্লাম-এর খুব প্রশংসা করেছিলুম। বুঝলুম তারই এই ফল।

পেয়ার আমাদের সঙ্গে ট্রামে করে আমাদের অস্লো পার করে দিয়ে এল। শহর যেখানে শেষ হয়েছে, আমরা সেখানে নেমে পড়লুম। পেয়ার বিদায় জানিয়ে ফিরে গেল।

আমাদের আবার যাত্রা শুরু হল।

এগিয়ে চললুম। একটার পর একটা গাড়ি আমাদের ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগল, কোনোটাই আমাদের পছন্দ হল না। মনে মনে ভাবছি, এমন একটা গাড়িকে হাত দেখাব, যেটা দ্বিরুক্তি না করে থেমে যাবে, কিন্তু সেরকম কোনো গাড়িই আমাদের চোখে পড়ছে না। বড় শহরে দু-একদিন থাকলেই লাফা-যাত্রীদের এই অসাড়তায় পেয়ে বসে। কিসের একটা বাধা বোধ হয়, হাত সহজে উঠতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত মানসিক বাধা কাটিয়ে আমরা হাত তুলে গাড়ি থামাবার চেষ্টা শুরু করে দিলুম। সাধারণত বড় বড় শহর থেকে বেরোবার সময় যা হয়ে থাকে, বিশেষ কোনো গাড়ি থামতে চায় না, আমাদেরও তাই হল। অনেকক্ষণ পরে যখন প্রায় ধৈর্যচ্যুতি হয়, সেই সময় আমাদের দুজনের হাত তোলা দেখে একসঙ্গে দুটো গাড়ি থামলো। একটা মোটার এবং তার পিছনে একটা লরি। আমরা মোটারটাকে সেলাম জানিয়ে ছুটতে ছুটতে লরিতে গিয়ে উঠলুম। মোটার ছেড়ে দিয়ে লরিতে ওঠায় লরিচালক কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ল। লোকটা কিন্তু দেখলুম ইংরেজী, জার্মান কিছুই জানে না। জানে শুধু নিজের ভাষা। আমরা ম্যাপ দেখিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ বুঝিয়ে দিলুম। লোকটা ঘাড় নেড়ে কি একটা বললে; তাতে করে ও যে সেই পথে কতটা যাবে, তা আমরা কিছুই বুঝলুম না। যাই হোক, গাড়ি ছেড়ে দিল।

লোকটা ভারি গপ্পে। ভাষার বাধা মোটেই মানে না। হাবে ভাবে ইঙ্গিতে তার মনের ভাব এমন বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, আমরা অবাক। কেন জানি না লোকটার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে আমরা 'জিপ্‌সি'—যাযাবর। হয়তো ভাল মোটার ছেড়ে তার পুরোনো লরিতে ওঠা, এ-ও একটা কারণ হতে পারে। বার বার কি একটা প্রশ্ন করছে এবং আমরা তার উত্তর দিতে পারছি না, এমনি চলেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি, সে তার ঝুড়ি থেকে বার করে কয়েকটা আপেল, একখানা প্রকাণ্ড পাঁউরুটি এবং দু'টিন সার্ডিন মাছ আমাদের সামনে ধরল।

আমরা বললুম—এসব কি?

সে আমাদের পিঠঝুলি দেখিয়ে বললে—ওর মধ্যে ভরে নাও। ইঙ্গিতে বললে—খেও।

বাজার করে ফিরছে সে, তার জিনিস আমরা নেব কেন? এ তো মহা বিপদ—আজ কি আমাদের চেহারাটা ভিখারীদের মতো দেখাচ্ছে নাকি? লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, আমরা 'জিপ্‌সি'

নই। কিন্তু আমাদের কথা শেষ হতেই সে আবার খাবার জিনিসগুলো এগিয়ে ধরলো।

তাতেও যখন আমরা নিলুম না, তখন তার একটু খটকা লাগল। তখন নানারকম উপায়ে সে জানতে চেষ্টা করল, আমাদের পেশাটা কি? করাত চালানোর, হাতুড়ি ঠোকার অভিনয় করলে, জুতো সেলাই-এর অভিনয় করলে, দেয়ালগাঁথা, চুনকাম করার নিখুঁত অভিনয় করলে, তারপর আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এর মধ্যে কোনটাতে আমরা দক্ষ?

আমি তখন আর থাকতে না পেরে আমার পিঠঝুলির পিছন থেকে একটা বাংলা মাসিক পত্রিকা টেনে বার করে গড় গড় করে বাংলা পড়ে যেতে লাগলুম।

বাংলা অক্ষরগুলো দেখে লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। বেশ বুঝলে এ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, এমন কি রাশিয়ার ভাষাও নয়। সেই দুষ্পাঠ্য অক্ষর এবং দুর্বোধ্য ভাষার উপর আমার অদ্ভুত দখল দেখে সে প্রথমে বিস্মিত হল এবং পরে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ল। অবশেষে সে বুঝল আমরা ছাত্র, বিদ্যাভ্যাস আমাদের পেশা, আমরা 'জিপ্সি' নই।

মাইল চারেক পথ চলে লরিটা আমাদের একটা মোড়ে নামিয়ে দিলে। আমরা নেমে বিদায় নিতে যাবো, দেখি লোকটা একটা ঠোঙায় কিছু 'রেড কারেণ্ট' ভরে হাতে করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। তার মুখের ভাব দেখে এবার আর আমরা সেই ক্ষুদ্র জিনিসটিকে গ্রহণ না করে থাকতে পারলুম না। লোকটা বিদায় নেবার সময় যা বললে, তার থেকে একটা কথা আমরা বুঝলুম যে, সে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু কেন দুঃখিত হয়েছে, সেটুকু বোঝবার মতো জ্ঞান আমাদের ছিল না। মিরেক আর আমি দুজনে তার দুটো মানে করলুম।

আমি বললুম—আমাদের 'জিপ্সি' বলে ভুল করার জন্যে লোকটা দুঃখিত।

মিরেক বললে—তা মোটেই নয়। আমরা ওর অন্য খাবার জিনিসগুলো

ফিরিয়ে দিয়েছি বলে ও দুঃখিত। আমরা সত্যিকারের জিপ্‌সি হলে ও নিশ্চয় খুশী হত।

শহরের আওতা পেরিয়ে এর পর গাড়ি থামাতে আমাদের আর বিশেষ কষ্ট পেতে হল না। গোটা চার-পাঁচ গাড়ি বদলে আমরা ঠিক দুপুর বেলা একটা গাছে-ঢাকা উঁচু জায়গার কাছে এসে পৌছলুম। সেখানে উঠলুম আমরা দুজনে দুপুরের আহারের বন্দোবস্ত করতে। স্টোভটা জালিয়ে আমি খানিকটা মাখন গালাচ্ছি ডিম ভাজবো বলে, মিরেক নিচে গিয়েছিল জল আনতে, ছুটতে ছুটতে এসে বললে—দেখ, দেখ, কে যায়!

আমি স্টোভ ছেড়ে একটা ঢিবির উপর উঠে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বিষম বেগে একখানা সাইকেল আসছে; তাতে চড়ে ওয়াই এম সি এর সেই ইংরেজ ছেলেটি।

আমাদের দেখতে পেয়ে সাইকেলের গতি একটু কমিয়ে হাত নেড়ে বললে—নমস্কার! নমস্কার! লাফা-যাত্রা কেমন চলেছে?

আমরা চেঁচিয়ে বললুম—মন্দ নয়, তবে এখনও বেশিদূর এগতে পারি নি।

ছেলেটি বললে—বিদায়! য়োটুনহাইমে দেখা হবে। দেখি কে আগে পৌছয়।

মিরেক আমায় বললে—কে আবার আগে পৌছবে? এ তো জানা কথা। দেখ না ওকে আমরা টপকে গেলুম বলে!

হোলও তাই। খাওয়া শেষ করেই আমরা একটা লরি পেয়ে গেলুম। কিছুটা এগিয়ে ইংরেজ ছেলেটিকেও দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল। তখন রাস্তা খাড়াই হতে শুরু করেছে। ছেলেটি সেই খাড়াপথে উঠছে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে, কিন্তু তার উৎসাহের বা আনন্দের বিন্দুমাত্র কমতি দেখলুম না। বেশ গলা ছেড়ে গান ধরেছে, তাতে স্ফূর্তিটা একটু বেশিই মনে হল। আমরা স্বীকার করলুম, সাইকেল করে দেশ দেখারও একটা বিশুদ্ধ আনন্দ আছে। তারপর ছেলেটিকে পিছনে ফেলে আমাদের লরি পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলল।

সে দিন সারাদিন চললুম আমরা উত্তরমুখো। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় আশি মাইল লম্বা এক সুন্দর হ্রদ। তারই গা ঘেঁষে আমাদের রাস্তা। মার্জারিন আর মাখন বোঝাই একটা গাড়ি এই হ্রদের ধারে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ আমাদের এগিয়ে দিল। সন্ধ্যের ঠিক আগে একটি যুবক টেনিস খেলে ফিরছিলেন, যাচ্ছিলেন হ্রদেরই একজায়গায় সাঁতার কাটতে। তিনি আমাদের তুলে নিলেন এবং হ্রদের তীরে 'বিরি' নামক এক মনোরম গ্রামে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

॥ ১২ ॥

সে রাত 'বিরি'তেই আমাদের কাটল। আমরা স্থির করলুম পরের দিন 'য়োটুনহাইম' অঞ্চলে পৌঁছতে হবে। ভোর বেলা উঠে হ্রদের জলে গা ধুয়ে পিঠে পিঠথুলি বেঁধে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, স্বচ্ছ আকাশের তলায় হ্রদের তীর ধরে হাঁটতে বড় মিঠে লাগছিল। ভাবছিলুম এখন বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি না এলেই ভালো হয়। মৃদুমন্দ ঢেউ উঠেছে হ্রদের জলে, একজন বুড়ো জেলে তার নৌকোর মধ্যে চুপটি করে বসে আছে জলের মধ্যে সুতো ফেলে। রাস্তায় দু একটি লোক দেখা যায়, গাড়ি একটিও নেই।

অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু একটা আওয়াজ পাচ্ছি, মনে হয় যেন একটা মোটর গাড়ির শব্দ। কেবলি মনে হয়, এখনই সেটাকে দেখতে পাবো—কিন্তু বহুক্ষণ পরেও রাস্তার উপরে কোনো গাড়ি দেখা যাচ্ছে না।

শব্দটা থেকে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার শোনা যাচ্ছে। আমাদের যখন ধারণা হয়েছে, ওটা দূরের কোনো কলকারখানার শব্দের প্রতিধ্বনি হবে-বা, ঠিক তখনই গাড়িটাকে দেখা গেল। অনেক দূর থেকে আসছে। দূরে থাকলেও এক দৃষ্টিতেই দেখে নিয়েছিলুম যে চালক একা, গাড়িতে আমাদের

দুজনেরই জায়গা হবে। এ জিনিসগুলো লক্ষ্য করা আমাদের বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

সূর্য ততক্ষণে অনেকটা উঠে পড়েছে। তাই আমরা ঠিক করলুম এ গাড়ি খানাকে ফস্কে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু গাড়িটা একটু এগিয়ে আসতেই মিরেক বললে—দেখেছ ব্যাপার ?

আমি বললুম—কি ?

মিরেক বললে—আওয়াজই সব—কিন্তু চলছে যেন শুঁয়োপোকার মতো।

আমি তখন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলুম।

মিরেক বললে—এইজন্যেই এতক্ষণ ধরে এবং অতদূর থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, অথচ জিনিসটা কাছে এগোচ্ছে না।

এ ভাঙা গাড়িতে আমাদের কোনো কাজ হবে না, এই মনে করে আমরা দুজনে এগিয়ে চলেছি রাস্তার একপাশ দিয়ে—গাড়িটা প্রায় আমাদের কাছে এসে পড়েছে। মিরেক সেই সময় অন্যমনস্ক হয়ে হাত তুলে একবার তার ঘাড় চুলকে ফেলেছে। আর যাবে কোথা ? ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে সেই আধভাঙা গাড়ি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে আমাদের গাড়ির মধ্যে তুলে নিলেন।

তারপরে আমরা অবশ্য এই ঘটনার জন্যে দুঃখ করি নি। কারণ ভদ্রলোক এমনই চমৎকার যে যাত্রা-পথে এমন সঙ্গী ক্ষণেকের জন্যে পাওয়াও মস্ত লাভ। আমরা গাড়িতে উঠতেই ভদ্রলোক সিধে রাস্তা ছেড়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গ্রামের পথে। আশেপাশে যত উপবন, হ্রদ আর ছবির মতো পল্লী-পথ আছে সেই সব আমাদের দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন আর তারই সঙ্গে স্থানীয় ইতিহাস, উপকথা, কিংবদন্তী বলে রীতিমতো জমিয়ে তুললেন। সেই মন্থর যন্ত্রে আমাদের পথে আমরা বেশিদূর এগোতে পারলুম না বটে কিন্তু সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না।

শেষে ভদ্রলোক ঘুরে-ফিরে আবার সেই হ্রদের ধারে আমাদের নিয়ে এলেন 'লিলিহামের' নামক এক গ্রামের কাছে। তখন দুপুর গড়িয়ে

গেছে। নিয়ে এসে বললেন—এই গ্রামে পাহাড়ের উপর নরওয়ের পল্লী-শিল্পের যে মিউজিয়াম আছে তা যদি না দেখি তাহলে নরওয়ে দেখাটা আমাদের বৃথা। তা ছাড়া সেলমা লেগারলফ এখন এই গ্রামে আছেন।

—ঐ তাঁর বাড়ি। বলে পাহাড়ের উপরে একটা বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

সেলমা লেগারলফ তাহলে এইখানে আছেন? আমরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় লেখিকা আমাদের মতো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন?

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয়ই করবেন। আপনারা যান, ওঁর সেক্রেটারি আছেন, তাঁকে বলুন। বললেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমরা পরম উৎসাহিত হয়ে নেমে পড়লুম। লিলিহামের মিউজিয়ামে নরওয়ের প্রতি অঞ্চলের চাষীরা উৎসবের দিনে যে সব পোশাক পরে তার একটি দুটি করে নির্দশন রয়েছে। যেমন তাদের রং তেমনি সূঁচের কাজ। এ ছাড়া বেতের কাজ, কাপড়ের কাজ, কাঠের কাজ, নানা রকম খেলনা। গ্রামের লোকেরা নিজের হাতে যা-কিছু সুন্দর জিনিস তৈরি করে তাই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

মিউজিয়াম দেখে আমরা সেলমা লেগারলফকে দেখতে গেলুম। সেক্রেটারি মহিলা আমাদের একটি কাঁচমোড়া ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরের বাইরে, একটু নিচের দিকে একটি চওড়া বারান্দায় নিশ্চল মূর্তির মতো বসে আছেন সেলমা লেগারলফ—মাথার সমস্ত চুল শাদা, ডান হাতে খোলা কলম, সামনে কাগজের স্তূপ। লিখছেন না, কিন্তু কি যেন ভাবছেন। মন চলে গেছে বহু দূরে, কোন দিগন্তের কোন রহস্যের সন্ধানে কে জানে? বারান্দার পরেই পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে হ্রদ পর্যন্ত। সমস্ত হ্রদ সেখান থেকে ছবির মতো চোখে পড়ে। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

সেক্রেটারি ফিসফিস করে বললেন—আজ বেলা বারোটার সময় এক-

দল বেলজিয়ান টুরিস্ট এসে ওঁকে অনেকক্ষণ বকিয়ে গেছে। সেই থেকে উনি বড় চঞ্চল হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছিলেন। এই প্রথম দেখছি স্থির হয়ে লিখতে বসেছেন। বারান্দায় তো কোনোদিন লেখেন না—আজ কি হল কে জানে? যাই হোক, মনে হচ্ছে, ঠিক এই সময়টিতে ওঁকে ডাকা ঠিক হবে না। আপনারা কি অপেক্ষা করতে চান?

আমরা বললুম—না না, কোনো প্রয়োজন নেই। এই তো দেখা হল। এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে?

এই বলে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। পাহাড় থেকে নেমে আমরা যখন রাস্তায় পড়েছি তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। সেদিন য়োটুনহাইম্ পর্যন্ত যাওয়া দেখলুম অসম্ভব। সুতরাং য়োটুনহাইম্-এর নিকটতম যে য়ুথ হস্টেল 'সিওআ' তাই হল আমাদের লক্ষ্য। রাস্তায় নেমে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছাদ খোলা মোটার এসে পড়ল। আমাদের দুজনেরই হাত তোলা দেখে গাড়িটা থামল, কিন্তু বেগ থাকার দরুণ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। আমরা ছুটতে ছুটতে গেলুম কাছে।

—কতদূর যাবেন?

—সিওআ যাবো, য়োটুনহাইম্-এর পথে। বলতে বলতে আমরা ততক্ষণে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠে বসেছি।

দুটি খুব স্ফূর্তিবাজ ছেলে। দেখেই বোঝা যায় দুই ভাই। খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে গাড়ি হাঁকাচ্ছে। তারা হেসে উঠল—এইটুকু পথ? এ তো হেঁটেই যেতে পারতেন। তার চেয়ে চলে আসুন আমাদের সঙ্গে ট্রণ্ড-হাইম। মধ্যরাত্রি অবধি সূর্য দেখতে পাবেন ওখানে।

হেঁটে অবশ্য সিওআয় যাওয়া যেত না—ওটা ঠাট্টা। সিওআ এখান থেকে মোটরেই পাকা তিন ঘণ্টার পথ। এই এতটা পথ মাত্র একখানা মোটার থামিয়েই আমরা পৌঁছে যাবো এটা কম ভাগ্যের কথা নয়। তার উপর আবার ট্রণ্ডহাইম্। মধ্যরাত্রির সূর্য। মনটা দোলা দিয়ে উঠল।

কিন্তু আবার মনে হল—তাহলে আমাদের পাহাড়ে বেড়ানোর কি হবে? সেটাই বা ছাড়ি কি করে? যতদূর সম্ভব বিনীত হয়ে বললুম—ট্রণ্ডহাইম্‌এ যেতে পারলে নিশ্চয় আমরা খুশী হতুম। কিন্তু য়োটুনহাইম্‌ পাহাড়ে হাঁটবো বলে আমরা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছি।

ছেলে দুটি আরো লোভ দেখাতে লাগল। বললে—পরের দিন চলে যাচ্ছে তারা 'ফিনমার্ক'-এ। সেখানে এক দ্বীপে এদের বাড়ি। সেই দ্বীপে থেকে বংশানুক্রমে সমুদ্রে মাছ ধরে এসেছে এরা।

এরা তাহলে জেলের ছেলে? মোটারে করে দেশ দেখতে বেরিয়েছিল, এখন বাড়ি ফিরছে? জন-কোলাহল-বর্জিত হিমসাগরে-ঘেরা দ্বীপে বছরের পর বছর এরা কেমন করে কাটায়, কি নিয়েই বা থাকে?

ছেলে দুটি বলে চললো—ফিনমার্ক! একটা দেখবার মতো জায়গা! পৃথিবীর সীমান্ত—যার পরে আর কোনো দেশ নেই, কোনো লোকালয় নেই! সামনে ধূ-ধূ করছে শুধু উত্তর মেরু। শীতের সময় অন্ধকারে কালো জলের কিনারায় নীলাভ শাদা বরফের পাহাড় জেগে ওঠে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের জল যেমন নীল হয়ে ওঠে ভূমধ্যসাগরেও অমন গাঢ় নীল রং হয় না। জেলেদের গ্রামে সব সময় কর্মব্যস্ততা—কেউ বসে নেই। কোথা দিয়ে যে সময় কাটে টের পাওয়া যায় না।

ছেলে দুটি বললে—এসো না, দেখে যাবে সব। থাকবে আমাদের অতিথি হয়ে। কোনো কষ্ট নেই।

বিষম লোভ। ফিনমার্ক-এর টানে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু পাহাড়ের কথা মনে পড়ে যায়—তাকেই বা বিসর্জন দিই কি করে? আমরা একটু ভেবে একটু ইতস্তত করে বললুম—এবারকার মতো পাহাড়েই চলি আমরা, কারণ ফিনমার্ক-এ একবার গিয়ে পড়লে সহজে তো ফেরা যাবে না। সেখানে লাফা-যাত্রা করার মতো হামেশাই গাড়িই বা পাবো কোথায়? তবে কথা রইলো এরপর নরওয়েতে এলে সোজা ফিনমার্ক!

ছেলে দুটি হাল ছেড়ে দিলে। গাড়ি চললো পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা রাস্তা

ধরে। অস্তগামী সূর্য তখন সোনালী হয়ে আলো দিচ্ছে। সেই মধুর আলোয় চারিদিকের সমস্ত জিনিস ঘষে-মেজে তকতকে হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন একটা প্রকাণ্ড আরশির মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে দেখছি। সেই আরশির মধ্যে দিয়ে কখন আমার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল দূর দূরান্তরে, ভাবছিলুম পাইন-বনের কথা, পাইন বনের মাথায় নীল আকাশের কথা। আবার ভাবছিলুম উত্তর মেরুর অতলস্পর্শী জলের কথা, যেখানে পর্বত প্রমাণ বরফের চাংড়া ভেসে বেড়ায়, যেখানে জেলেরা বড় বড় জাল দিয়ে বড় বড় মাছ ধরে!

হঠাৎ ঘ্যাঁচাং করে ব্রেক কষার ধাক্কায় চট্ করে ফিরে আসি প্রত্যক্ষ জগতে। সামনে দেখি একপাল ভেড়া পড়েছে। ভেড়াগুলো পাহাড়ের খাড়াই থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে নীচে চলেছে এক গ্রামের দিকে। আমাদের চালক প্রাণভরে মোটারের ভেঁপু বাজিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভেড়াদের কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা যেমন ধীর মন্থর গতিতে চলছিল ঠিক তেমনি চলেছে দলে দলে কাতারে কাতারে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি—এত ভেড়া, কোথায় ছিল এরা? কোথায় থাকে এরা! ঐটুকু গ্রামের মধ্যে কি করে ধরে এদের? এমন সময় মিরেকের কাছ থেকে কনুইয়ের এক ধাক্কা!

আমাদের পাশে প্রকাণ্ড একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। ভেড়ার জন্তে সে-ও রাস্তা পার হতে পারছে না। চেয়ে দেখি লরির উপরে একটা সাইকেল। আর সেই সাইকেল ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি আরাম করে বসে সেই ইংরেজ ছেলেটি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত হল।

মিরেক ততক্ষণে চিৎকার শুরু করেছে—হ্যালো, হ্যালো, নমস্কার, কেমন আছেন?

ছেলেটি মিরেকের গলা শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আমাদের দেখে অবাক। বললে—এরকমভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারি নি।

মিরেক বলেল—জয়, লাফা-যাত্রার জয়। চললেন কোথায়?

ভেড়ার পাল তখন শেষ হয়ে গেছে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে—এবার আর য়োটুনহাইম্ হল না, চলেছি ট্রণ্ডহাইম্।

মিরেক চেঁচিয়ে বললে—সেকি? আপনার হাঁটার তাহলে কি হবে?

লরিটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমরা শুনতে পেলুম, ছেলেটি বলছে—চুলোয় যাক হাঁটা। লাফা-যাত্রা করছি দেখছেন না? চলুক এখন লাফা-যাত্রা।

সাঁ করে লরিটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বললুম—বাবাঃ, এই না ইংলণ্ডের লাজুক ছেলে? শুধু নিজে নয়, সাইকেল শুদ্ধু নিয়ে লাফ দিচ্ছে? সাবাস্!

মিরেক বললে—নরওয়ের হাওয়া লেগেছে।

এঁকে বেঁকে চললো আমাদের গাড়ি। কয়েকটা বাঁক পার হয়ে একটু পরেই আমরা আমাদের গন্তব্য-স্থান সিওআয় এসে পৌছলুম।

সিওআ হচ্ছে ঘন বনের কিনারায় পাহাড়তলীর একটি গ্রাম। বনের ছায়ায় আমাদের য়ুথ হস্টেল। জায়গাটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। আমাদের শীত করে এলো। ঠিক করলুম, তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া যাবে। কাল ভোরে উঠে এখান থেকে হাঁটন শুরু করব। এখান থেকে একটা পায়ে-হাঁটা পথ বনের মধ্যে দিয়ে উঠে গেছে 'গিয়েণ্ডেস্হাইম্' কুটির পর্যন্ত। হেঁটে যেতে প্রায় সারাটা দিন লাগে। একটা সরু মোটারের রাস্তাও আছে। সেটা এখান থেকে গিয়েছে একটু ঘুরন-পথে। 'গিয়েণ্ডেস্হাইম্'-এই মোটারের পথ শেষ। মোটারযাত্রার পক্ষে এ পথটুকু এতই ছোট যে, এ-পথে নিশ্চয়ই গাড়ি খুব কম চলে। তা নইলে লাফা-যাত্রার কথাই আমরা ভাবতুম।

আমরা খুব ভোরে উঠলুম যাতে যাত্রার পর্বটা তাড়াতাড়ি সমাধা হয়। উঠে ঝরনার জলে হাত-মুখ ধুয়ে য়ুথ হস্টেলে ফিরে এসে দেখলুম, সেই অন্ধকার বনচ্ছায়ায় সমস্ত হস্টেল তখনও নিদ্রামগ্ন। ঝি, চাকর, রাঁধুনি, ম্যানেজার কেউ কোথাও নেই। আমরা কি করব ভেবে পেলুম না। কিছু খাবার মুখে

দিয়ে এবং দুপুরের খাওয়ার জন্যে কিছু রুটি, ডিম, পনির সংগ্রহ করে আমাদের অনতিবিলম্বে বেরিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। হোস্টেলের কুকুর-বেড়ালটা পর্যন্ত তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি।

পাহাড়ী যুথ হস্টেলে সাধারণত খুব সকাল সকাল দৈনন্দিন জীবন শুরু হয়। দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে চরণিকদের জুতো পালিস করা, থালা-বাসন মাজা প্রভৃতির শব্দে হস্টেল সরগরম হয়ে ওঠে। এখানে কিন্তু জীবন বা জাগরণের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আমরা দুজনে থমকে গেলুম এবং কি করব ভেবে না পেয়ে বোকার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। গাছতলায় ঠাণ্ডার মধ্যে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে শীত করে এলো। রান্নাঘরে গিয়েও কোনো লাভ হবে না জানতুম, কারণ সেখানে তখনও উনুনে আঁচ পড়ে নি।

মিরেক একবার বললে—চলো বেরিয়ে পড়ি, কতক্ষণ আর এদের জন্যে বসে থাকব ?

আমি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বার দুই তিন হেঁচে বললুম—বাবাঃ, শীতে যা নাক সড়সড় করছে, এক পেয়ালা গরম কফি না খেয়ে আমি তো নড়তে পারব না।

বেলা প্রায় দশটার সময় যখন আমাদের ধৈর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন 'ব্রেকফাস্ট' খেতে পেলুম। দুপুরের জন্যে কিছু খাদ্য কিনে পিঠঝুলিতে ভরে বেরিয়ে পড়তে পৌনে এগারটা বেজে গেল। যাবার আগে হস্টেলের ম্যানেজারকে বুক ঠুকে প্রশ্ন করে বসলুম—আচ্ছা, আপনার হস্টেলে এত বেলা করে সবাই ওঠে কেন ?

ম্যানেজার বললেন—এখানে ভোরে ওঠা মানেই ঠাণ্ডা লাগানো—দেখছেন না, জায়গাটা কি রকম স্যাঁৎসেতে ? আমরা সবাই তাই দেরি করেই উঠি।

আমি আরো বার দুই হেঁচে সেই শ্লেষ্মাত্মক হস্টেল ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকখানি সময় আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে, এখন জোরে পা না চালালে সন্ধ্যের আগে গিয়েওসহাইম্ কুটিরে [illegible] সম্ভাবনা নেই। বনের

মধ্যে মাইল দুই মোটারের রাস্তা ধরে চলতে হবে, তারপর পাকদণ্ডি আরম্ভ। আমরা জোর কদমে শুরু করলুম হাঁটন। কিন্তু আমাদের লাফা-যাত্রী কপাল চললো আমাদের সঙ্গে।

মাইলখানেক গেছি, এমন সময় পিছনে শুনি মোটারের ভোঁ। পিছন ফিরে দেখি, সরু পাহাড়ী বন-পথ দিয়ে একখানা গাড়ি আসছে, তার পিছনের সীট দুটোই খালি। এরকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায় না। সারাদিনের মধ্যে আজ আর কোন গাড়ির মুখ দেখবার সম্ভাবনা নেই। গাড়িটাকে থামালুম। একজন জার্মান ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চলেছেন গিয়েণ্ডেস-হাইম কুটির পর্যন্ত। খুশী মনেই আমাদের তুলে নিলেন। ভদ্রলোক জার্মানীর কোনো ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মচারী, নরওয়েতে এসেছেন বেড়াতে। পিঠঝুলি নিয়ে দুজনে য়োটুনহাইম্‌এ হাঁটবেন কয়েকদিন আপাতত এই প্ল্যান।

এবড়ো-খেবড়ো বুনো রাস্তায় গাড়ি চললো ঝাঁকানি খেতে খেতে মন্থর গতিতে। সমস্ত পথ জনহীন। একটি মানুষ, একটি লোকালয় কোথাও চোখে পড়ল না। ক্রমে বনের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা উপর-পাহাড়ে উঠে এলুম। সেখানে গাছ নেই, ঘাস নেই, পাতাটি নেই। আছে শুধু শেওলা-ঢাকা নেড়া পাহাড় আর তারই কোলে কোলে নীরব নিথর হ্রদের মালা—এই হচ্ছে য়োটুনহাইম্।

গিয়েণ্ডেস্‌হাইম্ কুটিরে যখন পৌছলুম তখন বেলা দুটো। হেঁটে এলে আজ সন্ধ্যে হয়ে যেত। এতটা সময় বেঁচে যাওয়ায় আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়ার সুবিধে হল। বারো চোদ্দ কিলোমিটার লম্বা এক হ্রদ, পান্নার মতো সবুজ তার জল, তারই এক প্রান্তে গিয়েণ্ডেস্‌হাইম্ কুটির। সেখান থেকে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় পায়ে-চলা পথ গিয়েছে হ্রদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সেখানে 'গিয়েণ্ডেবু' কুটির। আমরা হ্রদের ধারে চটপট খাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

পিঠঝুলি পিঠে নিয়েই আবার আমার দুটো হাঁচি পড়ল। আমি নাক

ঝেড়ে মিরেককে বললুম—মিরেক, শ্লেষ্মাত্মক বনে ভোরে ঘুরে বেড়িয়ে আমার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে দেখছি আজ আমায় পেড়ে না ফেলে!

মিরেক বললে—চলো পা চালিয়ে, হ্রদের হাওয়ায় সব সেরে যাবে।

হলও তাই। উঠলুম আমরা গিয়ে পাহাড়ের চুড়োয়। তারপর নীল আকাশের তলে শুরু হলো আমাদের চলা। বাঁদিকে রইলো পান্নার মতো সবুজ হ্রদ, ডানদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত। হাঁটতে হাঁটতে সূর্য নেমে যায় পাহাড়ের পিছনে। দিকসীমা খানিকক্ষণ লাল হয়ে তারপর আবার ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার উজ্জ্বল আলো আকাশের গায়ে লেগে থাকে। হ্রদের সীমানায় যে-কুটির একটি বিন্দুর মতো চোখে পড়ছিল, নিকটতর হতে হতে ক্রমে তা একটি বড়সড় বাড়িতে পরিণত হয়। আমরা যখন 'গিয়েগেবু' কুটিরে পৌঁছলুম তখন আমার সর্দি-টর্দি সব সেরে গেছে। কুটিরে প্রবেশ করে দেখি খাবার ঘরে স্যুপ পরিবেশন করা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা দুজন ক্ষুধার্ত পথিক আর দেরি না করে পিঠ থেকে পিঠঝুলি দুটো নামিয়েই বসে গেলুম একটা টেবিলে।

খাবার টেবিলে একটি নরোয়েজিয়ান ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। সে প্রতি বছর শীতকালে য়োটুনহাইম্-এ আসে 'শী' নিয়ে বরফের উপর দৌড় দেবার জন্যে। 'শী-ইং' করবার আদর্শ স্থান হচ্ছে এই য়োটুনহাইম্। হ্রদের জল এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সমস্ত জমে যায়। তার উপর পুঞ্জ পুঞ্জ জমা হয় নরম তুষার—চারিদিক শুধু শাদায় শাদা। পাহাড়ের একটা চুড়োয় গিয়ে ওঠো, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নাও, তারপর হাঁটুর আর কোমরের সামান্য একটু চালন, সঙ্গে সঙ্গে 'শী' চলতে শুরু হল। হু হু করে নামতে লাগলে হ্রদের দিকে। প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চললো তোমার গতি। চুড়োয় উঠতে লেগেছে তোমার হয়তো আধ ঘণ্টা, নেমে এলে এক মিনিটে—দুরন্ত গতিতে, ঝড়ের মতো, হাঁটু দুটো কুঁকড়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, হাতের লাঠি দুটো পিছন-বাগে উঁচিয়ে ধরা, কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে বরফান্ হওয়া। হ্রদে এসে যখন নামলে তখন আর পা চালাতে হলো না। বরফের উপর দিয়ে

স্কী-জোড়া গড়িয়ে চললো এক্সপ্রেস রেলগাড়ির মতো। একজনের পর একজন স্কী-চালক এক মিনিট, দু মিনিট অন্তর সেই একই রাস্তায় চলেছে সারি বেঁধে, পাহাড়ের পর পাহাড়, হ্রদের পর হ্রদ চলেছে পেরিয়ে এক কুটির থেকে আর এক কুটিরে। মাঝে মাঝে কেউ খাচ্ছে আছাড়—ধুলো নেই, কাদা নেই, চোট লাগা নেই, গায়ের বরফ ঝেড়ে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে—এ এক অপূর্ব খেলা। বলতে বলতে ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে যেন চোখের সামনে দেখতে লাগল সমস্ত য়োটুনহাইম্ বরফে শাদা হয়ে গেছে।

—তোমরা শীতকালে এসো একবার এখানে, দেখবে এখানকার বাহার। আমি তোমাদের সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব। এখানে এমন কুটির নেই যেখানে আমায় চেনে না। এই নাও আমার ঠিকানা, একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই চলে আসব আমি এই পাহাড়ে।

আমরা প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে জানালুম, শীতের সময় সুযোগ করতে পারলেই আমরা এখানে চলে আসব।

নরওয়ের মতো দূরদেশে আসতে হলে সারা বছরের হাত-খরচ জমিয়ে কিভাবে যে আমাদের আসতে হয় সেটা আর তাকে বললুম না।

য়োটুনহাইম্-এ কোন পথে হাঁটব তা আগে থেকে আমরা ঠিক করি নি। মনে করেছিলুম যে, যেদিকে দু চোখ যায় সেইদিকেই যাব। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম—কাল আমাদের হাঁটার কোনো প্ল্যান ঠিক করি নি, বলতে পারো কোনদিকে যাওয়া যায়?

ছেলেটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ম্যাপে আঙুল দেখিয়ে বললে—চলে যাও টিন্ হ্রদের তীরে 'টিন্হলমেন্' কুটিরে। প্রথম দিকের পথটা ততো ভালো নয়, কিন্তু শেষটা অতি মনোহর।

॥ ১৩ ॥

আমরা তার পরদিন বেরিয়ে পড়লুম পিঠঝুলি পিঠে নিয়ে 'টিন্‌হলমেন' কুটিরের উদ্দেশে। যাত্রার প্রথম অংশটা সত্যিই বড় একঘেঁয়ে। শুধু পাথর আর পাথর। গাছ নেই, পালা নেই, হ্রদের দৃশ্য নেই, সব সময় এক সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে হাঁটা-পথ উপর দিকে উঠেছে তো উঠেছেই। সামনে, ডাইনে বাঁয়ে পায়ের নীচে ধূসর-বর্ণ শিলা আর কাঁকর ; শুধু মাথার উপর এক ফালি নীল আকাশ। হঠাৎ এক সময় চোখে পড়ে পথের ধারে এক থাবা বরফ। ক্রমে আশেপাশে থলো থলো ছড়ানো বরফ আরো চোখে পড়তে থাকে। শেষে শাদা বরফের একটানা চাদর দেখতে পাই। আমরা রীতিমতো বরফের রাজ্যে এসে পড়ি। শীতের সময় যে-সমস্ত বরফ জমেছিল এখানে এখনও তা সম্পূর্ণ গলবার সুযোগ পায় নি।

চরণিকের কখনো ধৈর্যচ্যুতি হয় না। আশপাশের দৃশ্য যখন বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে চরণিক বুঝে নেয় যে শীঘ্রই এ পথ ফুরোবে ; আবার নতুনতরো রাস্তা আরম্ভ হবে। তখন নিজের চলার ছন্দে সে হয়ে যায় মশগুল। আমরা যখন এমনি মশগুল হয়ে চলেছি, হঠাৎ এক সময়ে দেখি, আমাদের আরোহণ শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন দেশের ছবি চোখের সামনে খুলে যায়। যে-পাহাড় অতিক্রম করে এলুম তারই অপর পৃষ্ঠে সুশ্যামল ভূমি গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে এক বিস্তীর্ণ হ্রদের জলরেখা পর্যন্ত। চারিদিকের মাটি গাছ পাতা ফুল যেন হেসে উঠল। হ্রদের পিছনে পর্বতশ্রেণী, তাদের চূড়ো শাদা বরফে ঢাকা। সেই শাদা মুকুটের ছায়া হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলুম জলের ধারে একটা শিং-ওয়ালা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। হরিণটা যে কতদূরে, উপর থেকে আন্দাজ করা কঠিন হল,

কিন্তু আমরা ঠিক করলুম, তাকে কাছে গিয়ে একবার দেখতে হবে। যেমন নিশ্চিন্তভাবে হরিণটা খোলা যায়গায় চরে বেড়াচ্ছে তাতে মনে হয় না এখানে মানুষ হরিণের সঙ্গে শত্রুতা করে। আশা করলুম কাছে গেলেও হয়তো হরিণটা ছুটে পালাবে না।

এখানে রাস্তা হারাবার কোনো ভয় আর নেই। এই হ্রদ যেখানে দুই পাহাড়ের সঙ্গমস্থলে সরু হয়ে শেষ হয়েছে সেইখান থেকেই 'টিন্‌হলমেন' কুটিরে যাবার মার্কা করা রাস্তা, ম্যাপে দেখলুম, একটা পাহাড় টপকে চলে গেছে। পাহাড়ের ওপারেই কুটির। কুটির পাহাড়ের আড়ালে থাকার ফলে চোখে পড়ল না। কিন্তু 'টিন' হ্রদের জল বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আন্দাজে মনে হল সবসুদ্ধ আড়াই ঘণ্টার পথ।

আমরা মার্কা দেওয়া পথ ছেড়ে চললুম হরিণ যেদিকে চরছে সেইদিকে। সন্তর্পণে চললুম যাতে গাছ-পালা মাড়িয়ে অযথা আওয়াজ না হয়। কথাও বন্ধ করলুম। হরিণটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অনেকটা নীচের দিকে নেমে এসেছি, এমন সময় দেখি জন্তুটা জল ছেড়ে কোনাচে ভাবে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। হরিণটার সঙ্গে কোন জায়গায় দেখা হয়ে যেতে পারে আন্দাজ করে নিয়ে আমরাও সেই দিকে পা চালালুম। আন্দাজ করে নিলুম এমন একটা জায়গায় গিয়ে আমরা থামবো যে হরিণটা উঠতে উঠতে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়বে।

পাহাড় বেয়ে খানিকটা উঠেই হরিণটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আমরা তখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি। একটি বেশ নিরিবিলি স্থান বেছে নিয়ে আমরা সেখানে বসে পড়লুম। আমাদের আন্দাজ ছিল হরিণটা এইখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও হরিণের কোনো চিহ্ন পেলুম না। শেষে হঠাৎ এক সময় চোখে পড়ল উঁচুতে অনেক দূরে হরিণটা অন্য এক জায়গায় চরছে। কোন পথ দিয়ে জন্তুটা যে সেখানে গিয়ে পৌঁছল বলতে পারি না অথবা সেইটাই যে আগেকার জন্তু তা-ও স্পষ্ট বোঝা গেল না।

কাছ থেকে হরিণ দেখার আশা আমাদের ছেড়ে দিতে হল। আমরা তাই ঠিক করলুম নেমে পড়া যাক হ্রদের তীর পর্যন্ত, তারপর জলের রেখা ধরে ধরে হ্রদের শেষে গিয়ে পৌছব। এই ভেবে আমরা বন-বাদাড় ভেঙে নামতে লাগলুম। রাস্তা বলে কিছুই নেই—যে যেদিক দিয়ে ডিঙিয়ে নামতে পারে! এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে নেমেছি, রাস্তার অভাবে মিরেক আর আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, মাঝে মাঝে মিরেকের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মাঝে মাঝে শুনছি শুধু নিজেরই পদশব্দ। গাছের অন্তরাল থেকে বুঝতে পারছি না হ্রদ আর কত নীচে। এমন সময় একটা ফাঁকা-মতন জায়গায় এসে পড়লুম।

সামনেই এক খরস্রোতা ঝরনা। ঝরনা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। তাই ঝরনার দিকে এগলুম পার হবার একটা সুবিধে-মতো জায়গা খোঁজবার জন্যে। কয়েক-পা এগিয়েছি, হঠাৎ সামনে দেখি সেই হরিণটা—কয়েক গজ মাত্র দূরে। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। হরিণ যে এমন বিরাট হতে পারে এ আমি কল্পনাও করি নি। উপর থেকে ছোট্টটি মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল একটা মাঝারি আকারের বাছুরের মতো হবে। কিন্তু এ যে দেখছি একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া। ঠিক ঘোড়ারই মতো উঁচু, ঘোড়ারই মতো মসৃণ দেহ—মাথায় শুধু ডালপালা মেলা উত্তুঙ্গ দুই শিং। শিং দুটোর জন্যে তাকে ঘোড়ার চেয়েও বড় মনে হয়। আমার এমনই চমক লেগেছিল যে, দেখি হাঁটু দুটো কাঁপছে। হরিণটাও আচমকা আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—দাঁড়াবার সে কি সুন্দর দৃপ্ত ভঙ্গি। তখনও তার পা ভিজে। এইমাত্র ঝরনা পার হয়ে এসেছে। আমি ভাবছিলুম, হাঁ এইরকম একটা জন্তুকে 'স্লেজ্' গাড়িতে জুতে বরফের নদী বরফের প্রান্তর পার হওয়ায় রোমাঞ্চ আছে বটে! এই হচ্ছে এদেশের বলগা হরিণ।

হরিণটা ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ঝরনার তীর ধরে উপরে উঠে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে ছিলুম। একটু পরে মিরেক এসে পড়ল। আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে—কি ব্যাপার?

আমি বললুম—ঠিক তুমি যেখানে, একটু আগে সেই হরিণটা শিং মেলে ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কই, কই, গেল কোথা?

—আর কই? ভাগ্য থাকলে দেখতে পেতে! অমন সুন্দর একটা দৃশ্য কি বেশিক্ষণ থাকে? চকিতের মধ্যে যায় মিলিয়ে। তা হলেও বোসো বরং ঐ পাথরটার উপর ঝরনার ধারে, যদি কোনো ফাঁকে আবার হরিণটা বেরিয়ে আসে!

বসলুম দুজন চুপটি করে। কানে আসতে লাগলো ঝরনার ঝর ঝর গান; হাওয়ার সঙ্গে উড়ন্ত জলের গুঁড়ো মুখের উপর ভেসে এলো। সূর্য পড়ল ঢলে কিন্তু কোনো ফাঁক দিয়েই হরিণকে আর বেরতে দেখলুম না। তখন আমরা উঠলুম।

রাস্তা ছেড়ে বেরাস্তায় আসার ফলে দেখলুম এদিক দিয়ে যেতে গেলে জুতো খুলে ঝরনা পার হতে হবে। একটা পাথরের উপর বসে জুতো মোজা খুলে ফিতের সঙ্গে ফিতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিলুম কাঁধে, তারপর জলে পা দিলুম। বাস্‌রে সে কি ঠাণ্ডা! মনে হয়, এইমাত্র কে যেন বরফ গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। আর কি স্রোত! আধ হাত মাত্র পা ডুবেছে, তাতেই মনে হয় উল্টে ফেলে দেবে। ছোট্ট ঝরনা, হাত দশেক চওড়া। পার হয়ে যখন এলুম, মনে হল, পায়ে আর কিছু নেই।

কিন্তু পা মুছে মোজা-জুতো পরতে পরতে পায়ের পাতা থেকে আরম্ভ করে, সারা গায়ে, এমন কি মাথা পর্যন্ত একটা চমৎকার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। আমরা গান গাইতে গাইতে চললুম পায়ে পা মিলিয়ে। সূর্য যখন অস্ত গিয়েছে ঠিক সেই সময় এসে পৌঁছলুম 'টিন্' হ্রদের তীরে 'টিন্‌হলমেন' কুটিরে।

কুটিরের সাধারণ শোবার ঘরে আমাদের বিছানা বেছে নিয়ে বিছানার উপর পিঠঝুলি রেখে মুখে একটু জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি, দেখি, কুটির-কর্তা একটা দূরবীন দিয়ে সকলকে কি দেখাচ্ছেন। আমরাও দিলুম দূরবীনে চোখ। এক অপরূপ দৃশ্য। যে পাহাড় পার হয়ে আমরা এলুম তারই ঠিক

পিছনে আরও উঁচু এক পাহাড়ের গা দিয়ে সারি বেঁধে চলেছে একটির পর একটি বলগা হরিণ। মাথায় তাদের শিং, গায়ে পড়েছে ডুবন্ত সূর্যের লাল কিরণ—ওখানে তখনো সূর্য অস্ত যান নি। যতদূর চোখ যায় শুধু হরিণ আর হরিণ, মাইলের পর মাইল।

কুটির-কর্তা বললেন, এখানকার পাহাড় ছেড়ে চলেছে সব উত্তর দেশে। সেখানে এখন আর বরফ নেই, বনভূমি সবুজে সবুজ, নদী নালা জলে ভর-ভর তারই—পাশে পাশে প্রচুর হরিণের খাদ্য। সেইখানে চলেছে সবাই।

হ্রদের ধারে 'টিন্‌হলমেন্‌' কুটিরটি অতি রমণীয়। এলে আর নড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু চরণিকের বসে থাকা শোভা পায় না। তাই আমরা ম্যাপ খুলে বসলুম পরের দিনের হণ্টনের প্ল্যান ঠিক করতে। ম্যাপ দেখছি, এমন সময় একজন বুড়ো-মত লোক এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

বললেন—আপনারা তো বিদেশী দেখছি, এ অঞ্চলে এর আগে কখনো এসেছেন নাকি ?

—এই প্রথম।

—কোন দিকে হাঁটা ঠিক করলেন ?

—এই তো দুটো রাস্তা দেখছি ম্যাপে। দুটো তিনটে কুটিরও রয়েছে। কিন্তু ক' ঘণ্টার পথ সেটা ম্যাপ দেখে বুঝে উঠতে পারছি না।

—দেখি দেখি, আরে এ তো আপনাদের শীতকালের ম্যাপ। ঐ যে সব লাল রেখা দেখছেন, ওগুলো তো বরফের উপর দিয়ে 'স্কী' করে যাবার রাস্তা, ও আবার হাঁটা-পথ নাকি ? শুনুন আমার কথা। রাস্তা ছেড়ে দিন। এখানে রাস্তা লাগে না—হ্রদ ধরে চলতে হয়। একটা হ্রদের পর আর একটা হ্রদ। এমন চমৎকার জায়গা কি আর সারা নরওয়েতে আছে ? আমি এসেছিলুম এখানে একদিনের জন্যে, রয়ে গেলুম ছ' মাস।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—বলেন কি ? ছ' মাস এখানে আপনি কি করছেন ?

—ঘুরে বেড়াচ্ছি। উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম, অগ্নি, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, যেদিকে দু-চোখ যায়, কিছুতেই আর ফুরিয়ে উঠতে পারছি না।

—এত সুন্দর এ জায়গাটা?

—সত্যিই সুন্দর। আর সবচেয়ে সুন্দর এই কুটিরটা। সারাদিন বেড়িয়ে রাতের আগে এখানে ফিরে আসতে ভারি ভালো লাগে। এই করছি ছ' মাস।

—আচ্ছা দেখুন তো 'স্কগাডাল্‌স্‌বোয়েম্‌' এই জায়গাটা। এখানে কি করে যাওয়া যেতে পারে?

—'স্কগাডাল্‌স্‌বোয়েম্‌'? চমৎকার রাস্তা। আমি ঐ কুটিরটা পর্যন্ত যাইনি বটে, কিন্তু ঐ রাস্তায় বহুদূর গেছি। যাবেন। এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি। টিন্‌ হ্রদ ধরে যাবেন খানিকটা, তারপর উঠবেন উপরে। তারপর এই হ্রদটা, তারপর এই হ্রদটা। দক্ষিণ দিকের হ্রদগুলোকে ছেড়ে দেবেন, ওগুলো বড় কাছাকাছি, একটার জল আরেকটায় গিয়ে পড়েছে, সহজে পার হওয়া যায় না। উত্তর ঘেঁষে যাবেন। রাস্তা চারিদিকেই আছে। পাহাড়ে জায়গা কিনা—গরু চলে হরিণ চলে পথ করে দিয়েছে। বাঁধা রাস্তা বলে কিছু নেই। ঘণ্টা ছ' সাত-এর রাস্তা স্কগাডাল্‌স্‌বোয়েম।

আমরা বললুম—রাস্তার কোনো চিহ্ন টিহ্ন নেই? পাথরের বা গাছের গায়ে রং টং?

—কিছু না, কিছু না। ঐ তো বললুম, এখানে চারিদিকেই রাস্তা। কোনো ভয় নেই, চলে যান আপনারা। ঐ যে হ্রদগুলো দেখিয়ে দিলুম তাদের তীর ধরে ধরে ঠিক পৌছবেন।

॥ ১৪ ॥

আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে তার পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম স্কগাডাল্স্-বোয়েম্ এর দিকে। পায়ে চলা একটা চওড়া রাস্তা টিন্ হ্রদের একটু উপর দিয়ে গিয়েছে। সেটা ধরে খানিকটা চলে আমরা ঠিক করলুম উঠে পড়ি পাহাড়টার উপর যে কোন একটা সুঁড়ি পথ দিয়ে। রাস্তা হারাবার ভয় এখানে নেই। গাছ-পালাগুলি ছোট, তা-ছাড়া হ্রদগুলিই এখানকার প্রধান চিহ্ন। সব সময় তাদের ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারব।

উঠলুম পাহাড়টার উপরে। চরণিক পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলার চেয়ে পাহাড়ের উপরে চড়তেই ভালবাসে। পথে যে পাহাড়গুলো পড়ে সেগুলোকে টপকাতে না পারলে তার মন ওঠে না। পাহাড়ের শিরে উঠে আমরা দেখলুম অতি সুন্দর দৃশ্য—বাঁ পাশে টিন্ হ্রদ, ডান পাশে আরেকটা কি হ্রদ, টিন্ হ্রদের চেয়ে অনেকটা উঁচু।

কম্পাস বার করে ম্যাপের উপর রেখে উত্তর দিকটা ঠিক করে নিলুম। আমাদের এখন উত্তর ঘেঁষে চলতে হবে, দক্ষিণ অংশের হ্রদগুলোকে পাশ কাটিয়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ, চারিদিক ঘিরে তার খাড়া পাহাড়। এক কোণ দিয়ে শুধু হ্রদের জল ঝরণার আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা দুইএর মধ্যে আমরা এমনি দুটো হ্রদ পার হয়ে এলুম। আমরা যেদিকে অগ্রসর হচ্ছি সেদিকে পাহাড় ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই খানিকটা পরেই আমরা বরফের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলুম। গুঁড়ো ঝুরঝুরে বরফ নয়। দিনের বেলা রোদে গলতে থাকে, রাত্রে আবার জমাট বাঁধে—তাইতে বরফের পৃষ্ঠ সমতল পিচ্ছিল। যেখানে ভিজে-ভিজে সেখানে পা পিছলোবার ভয়, সাবধানে চলতে হয়।

একটু নীচে নামলেই বরফ আবার শেষ হয়ে যায়। তখন পাথরের উপর শুধু শুকনো শেওলা—মনে হয় কার্পেটের উপর হাঁটছি। হ্রদের সীমানায় পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে মনে হয় 'শী-ইং' করবার এমন জায়গা আর হতে পারে না। পা নিস্‌পিস্ করে ওঠে। মনে হয় শেওলা না থেকে যদি এখানে থাকতো তুষার-পুঞ্জ তাহলে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তুম। 'গিয়েণ্ডেবু' কুটিরে যে ছেলেটি আমাদের এ অঞ্চলের শীতের দৃশ্য আর শী-খেলার কথা রসিয়ে রসিয়ে বলেছিল তার কথা মনে পড়ে।

ম্যাপ দেখে কম্পাস দেখে আমরা এগিয়ে চলি। এইভাবে পাচ ঘণ্টা। একটা হ্রদ এইমাত্র পার হয়ে এসেছি—ম্যাপে দেখছি মাঝে খানিকটা জমি, তারপর আর একটি ছোট হ্রদ, সেটাকে বাঁয়ে রেখে পেরিয়ে গেলেই আমরা স্কোগাডাল্‌স্‌বোয়েম কুটিরের কাছে এসে পড়ব। আমরা খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলুম। যে জমিটুকু আমাদের পার হতে হবে সেটা ক্রমেই উপর দিকে উঠে গেছে এবং বেশ খাড়া একটা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। পাহাড়টা পাঁচিলের মতো। বেশ বোঝা যায় তারই ওপারে একটি হ্রদ—ম্যাপে যে হ্রদটা আমরা দেখছি, এবং যেটা পেরলেই স্কোগাডাল্‌স্‌-বোয়েম পৌছান সহজ হবে। আমরা চার হাত-পায়ে প্রায় ঝুলে ঝুলে সেই পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে উঠলুম।

ওপারের দৃশ্য অভিনব। আমরা যা দেখবো আশা করেছিলুম তার সঙ্গে একটুও মিললো না। ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছিল ছোটখাটো একটি হ্রদ। কিন্তু দেখলুম বিরাট এক জলাশয়। তার চারিপাশেই খাড়া পাহাড়, দেয়ালের মতো। হ্রদের এক সীমানায় প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু এক ঝরনা। তার ঝরঝর শব্দে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত। চোখে দেখা যায় না যদিও, তাহলেও বেশ বোঝা যায়, খাড়া প্রাচীরের মতো পাহাড়ের পিছনে একটি হ্রদ রয়েছে, তারই জল উপচে পড়ে এই ঝরনার সৃষ্টি। ঝরনার জলেই ভরে উঠছে এই হ্রদ এবং অপর একদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার জল, বুঝছি, ঝরনারই রূপে। হ্রদের তীরে তীরে বরফ জমে রয়েছে। এই হ্রদের সীমানা

পার হতে গেলে নীচে নেমে গিয়ে ঐ বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। উপর দিয়ে যাবার উপায় নেই, কারণ পাহাড়ের গা এমনই খাড়া যে সেখানে পা রাখা অসম্ভব। হ্রদের তীরে জলের গা ঘেঁষে যে বড় বড় হুড়ি পড়ে আছে তারই উপর যেখানে বরফ জমে আছে চলবার সুবিধে শুধু সেইখানেই।

কিন্তু মুশকিল এই যে হ্রদের যেদিকটায় নুড়ির উপর বরফ জমে আছে সে-দিক দিয়ে আমাদের এগোবার কথা নয়। ম্যাপ খুলে কম্পাস বসিয়ে দেখছি যেদিক থেকে ঐ প্রকাণ্ড ঝরনাটা ঝরে পড়ছে সেই দিকেই আমাদের যেতে হবে। অথচ ঝরনার যে রূপ দেখছি কোন রকমেই তাকে পার হওয়া অসম্ভব। সব চেয়ে মুশকিল, যে হ্রদের জল উপছে এই ঝরনার জলের সৃষ্টি, সেই হ্রদের কোনো চিহ্নই আমাদের ম্যাপে নেই।

মিরেক আর আমি অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলুম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখলুম। কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে যেখানে আমরা বসে আছি ম্যাপে তার কোনো হদিস নেই।

আকাশে একটা মস্ত কালো মেঘ উঠছিল, তার ছায়া পড়েছে হ্রদের জলে। হাওয়াটা গুমোট হয়ে উঠছে। ঝরনার জলের অক্লান্ত শব্দে সমস্ত আবহাওয়া কেমন যেন থমথম করছে। মনে হয়, এ পথের শেষ এইখানেই, এর পরে আছে দুর্লঙ্ঘ্য শিলা, বন্য জলস্রোত, বিপদসঙ্কুল তুষারক্ষেত্র। এইসব ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল, জলের ধারে নুড়ির উপর যেখানে বরফ, সেখানে ছোট্ট একটি পাথরের স্তূপ—মানুষের হাতে সযত্নে গড়া। মিরেক দেখেই বললে—হয়েছে। ঐ তো শী-ইংএর পথ। শীতের সময় সব যখন বরফে ঢেকে যায়, তখন তো ঐভাবেই রাস্তার চিহ্ন দেওয়া হয়।

ভাল করে লক্ষ্য করতেই অনেক দূরে আরও একটা স্তূপ চোখে পড়ল— হ্রদের জল যেদিক দিয়ে উপচে পড়ছে, সেই দিকে।

আমরা যেন গোলোক ধাঁধার মধ্যে পথের হদিস পেলুম। গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একটি মানুষ, একটি পথিকও আমাদের চোখে পড়েনি। কতকাল আগে যে এই পথ দিয়ে মানুষ গেছে তা জানিনা, কিন্তু একবার যখন গেছে

তখন আমরা ঠিক করলুম আমরাও যাবো। উঠে পড়লুম দুজনে পিঠঝুলি পিঠে নিয়ে। নামলুম পাহাড়ের গা বেয়ে হ্রদের তীরে। তারপর বরফের উপর দিয়ে চলতে শুরু করলুম। ভিজে বরফ, তার তলার অংশ গলে জল হয়ে হ্রদের সঙ্গে মিশছে। সন্তর্পণে চলতে হয়—পা পিছললেই হ্রদের কন্‌কনে জলে স্নান ঠেকায় কে?

প্রায় আধঘণ্টা লাগল হ্রদের অপর সীমানায় পৌছতে। কালো মেঘে আকাশ তখন ছেয়ে গেছে। মাথার উপর কোনো আচ্ছাদন নেই, উদ্ভিদের মধ্যে তো শুধু শুকনো শেওলা। বৃষ্টি যদি আসে, এলে জোরেই আসবে, তাহলে ভিজতে হবে। তাই যখন দেখতে পেলুম হ্রদ থেকে যে জলস্রোত বেরিয়ে গিয়ে নীচে পড়ছে তার ঠিক ওপারেই আরো একটি পাথরের স্তূপ সযত্নে গড়া রয়েছে, তখন আমাদের ভারি আনন্দ হল। কোনো রকমে এই স্রোতটাকে পেরিয়ে যেতে পারলেই হয়।

স্রোতটা হাত-কুড়ি চওড়া হবে। হ্রদ থেকে বেরিয়ে সমান জমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত, তারপরেই ঝরণা হয়ে ঝরে পড়ছে। স্রোতের কাছে এগিয়ে যেতেই সেই ঝরে পড়ার শব্দ পেলুম। আরো একটু কাছে এগিয়ে যেতে দেখলুম—ওরে বাসরে, এ যে এক বিরাট ঝরনা! কি তার শব্দ! জল যেন আছড়ে পড়ছে। উড়ন্ত জলকণায় সমস্ত জায়গাটা একেবারে ঝাপ্‌সা। সেই ঝাপ্‌সার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে অনেক নীচে এক প্রকাণ্ড হ্রদ, আমাদের এই হ্রদটার প্রায় দ্বিগুণ! উপর থেকে জলপ্রপাত আর হ্রদ দেখলে মাথা ঘুরে যায়! কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের ম্যাপে এ হ্রদেরও কোনো চিহ্ন নেই। তিন তিনটে বড় বড় হ্রদ, একটার জল আর একটায় গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে, বিরাট জলপ্রপাত, কে জানে আরো হয়ত আছে, অথচ ম্যাপে এদের কোনো নিশানা নেই। যা আছে তা হচ্ছে কয়েকটা ছিটে ফোঁটা জলাশয়ের চিহ্ন। ভারি গোলমেলে ঠেকলো।

যাই হোক, ম্যাপে থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা যখন ঠিক করেছি

এগিয়ে যাবো এবং 'শী-ইং'-পথের পাথরের স্তূপ দেখে চলবো, তখন লাগা যাক সেই কাজে। প্রথমে চেষ্টা করলুম এমন একটা জায়গা খুঁজে বার করা যেখান থেকে টপকে পাথরের উপর পা দিয়ে ওপারে পৌছান যায়। কিন্তু প্রথম শিলাখণ্ডের উপর মিরেকের পা পড়তেই সেটা পায়ের চাপে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জল উঠলো লাফিয়ে প্রায় মিরেকের হাঁটু পর্যন্ত। আমরা বুঝলুম এরকম নড়বড়ে পাথরের উপর দিয়ে এই খরা স্রোতস্বিনী পার হওয়া বিপজ্জনক। কয়েক গজ ভেসে গিয়ে জলপ্রপাতের মুখে পড়লে আর আমাদের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

কি করে কোথা দিয়ে লোকেরা এই প্রবাহিনী পার হয়? অনেক ভাবলুম। নিশ্চয় একটা কোনো সহজ রাস্তা আছে, না হলে স্রোতের এপারে ওপারে দুটো পাথরের স্তূপ এমন লোভনীয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত না। কিন্তু কোনো সহজ পন্থাই আবিষ্কার করতে পারলুম না। তখন আমরা আর এক উপায়ের কথা ভাবলুম। জলপ্রপাতের কাছে জলের টান বড় বেশী। হ্রদের মুখে জলের গভীরতা বেশী। তাই মাঝামাঝি একটা জায়গা বেছে নিয়ে ঠিক করলুম বড় বড় পাথর বয়ে এনে একটা সেতু বেঁধে ফেলব। বিশ হাত মাত্র জল, কতক্ষণই বা লাগবে কয়েকটা পাথর জলে ফেলতে?

পিঠঝুলি নামিয়ে শার্টের হাতা গুটিয়ে তখনই কাজে নামা গেল। দুজনে ধরাধরি করে ভারি ভারি পাথর কয়েকটা এনে স্রোতের ধারে জমা করলুম। তারপর ঝপাং ঝপাং করে ফেলতে লাগলুম জলে। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। পাথর ফেলতেই জল উঠলো তার উপর লাফিয়ে—যেন ফোঁস্ করে গর্জে উঠল। আধ ঘণ্টা দুজনে মিলে অক্লান্ত খাটলুম, কিন্তু ফল যেটুকু হল তা দেখে সেতুবন্ধনের আশা সেদিনের মতো আমাদের ত্যাগ করতে হল।

আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, একটা ঠাণ্ডা বাতাসও উঠেছে। তখন আমরা শেষ চেষ্টা দেখলুম, জুতো খুলে পা ডুবিয়ে স্রোতটুকু পার হওয়া যায় কি না। অল্পই তো দূরত্ব, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

ভাগ্যক্রমে দুজনে দুটো শক্ত লাঠি কুড়িয়ে পেলুম। কে ফেলে গেছে জানিনা। স্রোতের মধ্যে এই লাঠি হবে আমাদের তৃতীয় পা। জুতো খুলে পিঠঝুলিতে ভরলুম—এবারে আর কাঁধে ঝুলিয়ে নিলুম না। তারপর ট্রাউজার গুটিয়ে নামলুম জলে। বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা জল। মনে হল পায়ের উপর দিয়ে করাত চলে যাচ্ছে। দু' এক পা অগ্রসর হতেই স্রোতের টান ভীষণ বেড়ে উঠল, পা করে উঠল টলোমলো। সামনে আরো প্রবল স্রোত। বুঝলুম যে সেই স্রোতের তোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা

আমি বললুম—মিরেক, ঠিক মনে হচ্ছে সমস্ত হ্রদটাকে উল্টে ফেলে কে যেন এইখান দিয়ে তার সবটা জল নিকেশ করে ফেলছে। এর মুখে আমরা খড় কুটোর মতো ভেসে যাবো।

মিরেক বললে—ফেরো, আর এগনো নয়। আমার পায়ে আর কোন সাড়াই নেই।

টলতে টলতে দুজনে ফিরলুম। স্রোতের এক-চতুর্থাংশও পার হতে পারিনি। পাথরের উপর বসে জমে যাওয়া পায়ের উপর জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরে স্কার্ফ ঘষলুম, তবে তার সাড়া ফিরে এল। তখন আমরা মোজা-জুতো পরে উঠে দাঁড়ালুম। সামনের দিকে যাবার আর কোনো প্রশ্ন উঠল না। এখন আসন্ন বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কোনরকমে টিন্‌হলমেন কুটিরে ফিরে যেতে পারলেই ভাল।

সুদীর্ঘ পথ বেয়ে ফিরে চললুম আমরা একটার পর একটা হ্রদ ধরে। ঝড়টা এলো, চলেও গেল। কি ভাগ্যিস বৃষ্টিটা আর হল না। এরকম বিফলতা আমাদের কখনো হয়নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আমরা কুটিরে ফিরে এলুম, কুটিরকর্তা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আরো অনেকে অবাক হলেন। হলেন না শুধু সেই বৃদ্ধ যিনি এই কুটিরে ছ' মাস আছেন।

|| ১৫ ||

তিনি বললেন—এ হবেই আমি জানতুম। আমি জানতুম আপনারা আজ টিন্‌হলমেন্‌ কুটিরে ফিরে আসবেন।

আমরা রাগত হয়ে বললুম—সে কি? আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ, আমারও তো ঠিক ঐ রকম হয়েছিল প্রথম দিন। গ্রীষ্মের ম্যাপ নিয়ে বেরিয়েছিলুম শীতকালে, আপনারা যেমন বেরিয়েছেন শীতের ম্যাপ নিয়ে গ্রীষ্মকালে। পথ হারিয়ে ফিরে এলুম এই কুটিরে। সেই থেকে এখানেই আছি।

আমরা আরো চটে বললুম—বা রে। আপনার উপদেশ অনুযায়ীই তো আমরা হ্রদের পর হ্রদ ধরে চলেছিলুম। তারপর এমন একটা জায়গায় এসে পড়লুম যার পরে আর জলের স্রোত পার হওয়া যায় না।

তিনি বলেন—আমার উপদেশ অনুযায়ী আপনারা যান নি। আপনাদের যতটা উত্তরে যাওয়া উচিত ছিল গেছেন তার চেয়ে ঢের বেশী। এই দেখুন ম্যাপ। যে-সব হ্রদ ধরে আপনারা যাচ্ছেন ভেবেছেন সেগুলি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা হ্রদ, ম্যাপে এই বিন্দুর মতো দেখানো হয়েছে। শীতের ম্যাপে যা ফুটকীর মতো, এখন এই ভরা গ্রীষ্মে বরফ গলে তা বড় বড় জলাশয়ের আকার ধারণ করেছে। যেখানে আপনাদের পথ হারিয়েছিল, এই দেখুন সে কোথায়! প্রায় বরফের রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। এই সব বিন্দু বিন্দু জলাধার আর শীর্ণ প্রবাহ এখন ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতের সময় যে সব প্রবাহিণী অনায়াসে মানুষ পার হয়ে যায় এখন তাদের কাছেই এগনো যায় না। আপনারা যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখান দিয়ে পার হবার কোন রাস্তাই এখন নেই।

এই বলে তিনি আমাদের দিকে হাস্যমুখে তাকিয়ে রইলেন।

আমরা বললুম—এ সব কথা আপনি আমাদের আগে বলেন নি কেন?

—বলে কি লাভ? আপনারা স্বইচ্ছায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়িয়ে দেখুন। চিনুন এখানকার পাহাড় পর্বত। 'স্কোগাডাল্‌স্‌বোয়েম্' যেতে চান, ভাগ্যে থাকে পৌছতে পারবেন। আমরা তো কেউ ভুল রাস্তা বলে দিয়ে আপনাদের ঘুরিয়ে মারিনি। ভুল আপনারাই করেছেন শীতকালের ম্যাপ এনে। তবে হ্যাঁ, রাস্তা ভুল হলে যদি কোন বিপদের ভয় থাকতো, তাহলে আমরা গাইড পাঠিয়ে হোক যেমন করে হোক সাহায্য করতুম। সে ভয় যখন নেই, হিন্‌হলমেন্‌ কুটিরে ফিরে আসবার যখন সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন ক্ষতি কি পথ হারালে? য়োটুনহাইম-এর শ্রেষ্ঠ অংশই তো দেখা হয়ে যাবে।

অদ্ভুত যুক্তি। আমাদের মুখে আর রা সরল না। আমরা শুধু বললুম—প্রচুর ধন্যবাদ।

মিরেক বললে—কাল যদি আমি এখান থেকে কেটে না পড়ি তো আমার নাম মিরেক নয়। এ বড় ভয়ানক বুড়ো, নিজে এখানে আটকা পড়েছে, আমাদেরও দেখছি বন্দী করতে চায়।

আমি বললুম—ঠিক বলেছ। স্কোগাডাল্‌স্‌বোয়েম মাথায় রইল। কাল ঠিক তার উল্টো দিকে পাড়ি দেব, কি বল?

মিরেক বললে—রাজি।

ম্যাপ দেখে আমরা তখন ঠিক করলুল পরদিন উত্তরে না গিয়ে যাবো সোজা দক্ষিণে। ছ' সাতঘণ্টা হাঁটলে পরে গিয়ে একটা মোটারের রাস্তা পাওয়া যাবে, সেটা গিয়েছে আঁকা বাঁকা পথে একটি ছোট্ট হ্রদের ধারে 'ফারনেস' নামে এক গ্রামে। সেই গ্রাম থেকে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দুয়েকের পথ 'আরডাল'। পশ্চিম নরওয়ের একটি খুব লম্বা ফিয়োর্ড এই আরডাল-এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আস্‌লো-ফিয়োর্ড দেখেছি, কিন্তু সে তো বাংলা ভাষায় যাকে বলে খাঁড়ি। সে যথেষ্ট গভীর বা যথেষ্ট লম্বা নয়। পশ্চিম নরওয়ের ফিয়োর্ডগুলিই সত্যিকারের ফিয়োর্ড। মাইলের পর মাইল শীর্ণ বারিবর্ত্ম

কঠিন পাথরের দেয়াল ভেদ করে দেশের মধ্যে ঢুকে গেছে। এইরকম একটা ফিয়োর্ড দেখবো বলে স্থির করলুম।

পরদিন সকলের কাছে বিদায় নিলুম। বুড়োকে গিয়ে বললুম—এবারে আর পুনর্দর্শনায় নয়। এবারে বিদায়।

বুড়ো বললে—বিদায়।

কুটির-কর্তা আমাদের পথ হারানোর ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোনদিকে যাচ্ছেন আপনারা ?

আমরা সংক্ষেপে আমাদের প্ল্যান বুঝিয়ে দিলুম। তিনি বললেন—তা হলে এক কাজ করুন। হ্রদের দক্ষিণে যে জায়গাটায় আপনারা যেতে চান সেখানে পৌছতে হলে একটা জলা পার হতে হবে। এই জলাটাকে পাশ কাটাতে গেলেই আপনারা আবার রাস্তার গোলমাল করে ফেলবেন। তার চেয়ে দাঁড়ান এক মিনিট, আমি আমার মোটার বোটটা বার করছি। হ্রদের এই অংশটুকু পার করে রাস্তাটা আপনাদের ধরিয়ে দি।

আবার পথ হারিয়ে একদিন ঘোরবার ইচ্ছে আমাদের আদপেই ছিল না। আমরা রাজি হলুম।

কর্তার সঙ্গে মোটার বোটে করে পাড়ি দিলুম। মিনিট কুড়ির রাস্তা। নল-খাগড়ার বনের মধ্যে লগি দিয়ে নৌকো ঠেলতে হল, সেখানে মোটার চললো না। তারপর আমরা তীরে এসে উঠলুম।

কর্তা বললেন—ঐ দেখুন কত বড় জলা। একে ঘুরে পার হতে গেলে দু ঘণ্টার ধাক্কা। যাই হোক, এই রাস্তা ধরুন, আর আপনাদের পথ হারাবার কোনো ভয় নেই। মাঝে শুধু একটা ছোট নদী পড়বে, সেটা জুতো খুলে পার হতে হবে।

আমরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম পথে। আগের দিনেরই মতো দিনটা গুমট। মাঝে মাঝে মেঘ, মাঝে মাঝে রোদ। হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি এলে ভিজতে হবে। ছ' সাত ঘণ্টার পথে কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। কিন্তু পথ এত সুন্দর যে, আমরা সব রকম চিন্তা মন

থেকে দূর করে দিয়ে প্রাণের আনন্দে হাঁটতে লাগলুম। আমাদের পথ প্রায় সবটাই টিন্ হ্রদের সমান্তরাল। বেশীর ভাগ সময়ই হ্রদকে দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু জানতুম হয় কাছে, নয় দূরে পাহাড়ের আড়ালে কি ঢালুর নীচে টিন্ হ্রদ লুকিয়ে আছে। টিন্ হ্রদের চতুপার্শ্ব চরণিকদের পক্ষে বোধহয় আদর্শ জায়গা। নিজেদের চোখ দিয়ে এইবার বুঝলুম যক্ষি বুড়োটা কেন এই জায়গায় আটকা পড়ে গেছে। বুড়ো নয়তো, ঘাগী-চরণিক।

দুপুর বেলা হ্রদের তীরে এক জায়গায় খাওয়া সেরে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলুম আমরা। রোদ আর নেই, হাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে, মেঘের রং কালো, আকাশে একটা এলোমেলো ভাব। পা চালিয়ে চললুম যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। ঘণ্টা দুয়েক লাগল একটা পাহাড় টপকাতে। পাহাড়টা টপকেই দেখতে পেলুম অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে মোটারের পীচ ফেলা রাস্তাটা। তার আগে একটা নদী রয়েছে যেটার কথা কুটির-কর্তা আমাদের বলে দিয়েছিলেন।

নদীটার কাছে যখন পৌছলুম তখন ঝড় উঠেছে। নদীর জলে পা দিয়ে দেখলুম যেরকম স্রোত তাতে হাতে একটা লাঠি নিয়ে নদী পার হওয়াই বিবেচ্য। কিন্তু কাছে-পিঠে কোথাও একটা উপযুক্ত লাঠি খুঁজে পাওয়া গেল না। ঝড়ের মধ্যে এখানে তো আর বসে থাকা যায় না, ওপারে গিয়ে রাস্তায় উঠে একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে। বিনা লাঠিতেই পার হবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় দেখি একজন লোক ওপার থেকে নদী পার হয়ে এপারে আসছে—হাতে তার একটা লাঠি। সে পৌছতেই আমরা প্রায় ছিনিয়ে নিলুম তার হাত থেকে লাঠিটা।

সে বললে—কি আশ্চর্য, দু-পারেই তো দুটো লাঠি থাকবার কথা। এ-পারের লাঠিটা গেল কোথায়? দেখবেন তো ওপারে গিয়ে আরেকটা লাঠি পান কিনা। পেলে এপারে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

মিরেক—তথাস্তু, বলে নেমে পড়লো জলে। ওপারে পৌছে লাঠিটা আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে এবং একটু খুঁজতে আর একটা লাঠিও তার চোখে পড়ল। আমি নদী পার হলুম।

ওপারে গিয়ে পা শুকিয়ে মোজা জুতো যখন পরছি ঠিক তখনই ঝড় থেমে বৃষ্টি আরম্ভ হল। কোথাও কোনো আচ্ছাদন দেখতে পেলুম না। বর্ষাতি টেনে বার করতে করতেই গেলুম বেশ ভিজে। তারপর ছুটলুম সেই মোটারের রাস্তাটার দিকে। ছুটতে ছুটতে দেখতে পেলুম অনেক দূর থেকে একটা মোটার আসছে—যতটা দেখা যায়, মনে হয়, খালি। ঠিক করলুম, এটাকে থামাতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ঐভাবে ছুটতে দেখেই খুব সম্ভব গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলো। আমরাও রাস্তার উপরে উঠে এসেছি গাড়ীটাও এসে পড়েছে আমাদের সামনে। হাত তোলা দেখে গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে থামলো।

আমরা কিছু বলবার আগেই চালক জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যেতে চান?

—'ফারনেস্'।

—উঠুন।

উঠে বসতেই চালক গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং গাড়ির খাপ থেকে একটা কালো টুপি বার করে মাথায় পরলে। আমরা সভয়ে দেখলুম সেটা একটা ট্যাক্সিড্রাইভারের টুপি—কোনো ভুল নেই।

কি সর্বনাশ। এ যে একটা ট্যাক্সি। এটা লাফা-যাত্রা হচ্ছে না ট্যাক্সি-যাত্রা হচ্ছে? কিছু বুঝতে পারলুম না। কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ 'ফারনেস্' এখান থেকে বহু দূর। কত ভাড়া হবে কে জানে? তাই মিরেক একটা ঢোঁক গিলে বললে—আপনি কি 'ফারনেস্' পর্যন্ত যাচ্ছিলেন না কাছাকাছি কোথাও? মাঝপথে আমাদের নামিয়ে দিলেও ক্ষতি নেই।

—না না ফারনেস, ফারনেসেই যাচ্ছি।

কিছুই বোঝা গেল না।

আমি মিরেককে ফিস্‌ফিস্ করে বললুম—আর এখন বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা। ভেবে নাও লাফা-যাত্রাই হচ্ছে। তাহলে মনের ফূর্তিটা বজায় থাকবে। তারপর ফারনেস্ পৌঁছে দেখা যাবে।

পাহাড়ে রাস্তায় এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে চললো আমাদের ট্যাক্সি। ভিজে কাপড় আস্তে আস্তে ট্যাক্সির মধ্যেই কতকটা শুকিয়ে গেল। তারপর শুরু হল অবতরণ। ঠিক সেই সময় মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠে পড়েছে। পাহাড়ের এক জায়গায় ফুটো করে বিরাট 'টানেল' করা হয়েছে; তার মধ্যে দিয়ে গেছে মোটারের রাস্তা। সেইটে পার হয়েই ট্যাক্সিওয়ালা গাড়িটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করালো। তারপর বললে—নেমে আসুন। দেখুন দৃশ্য।

আমরা বেরিয়ে এলুম। এখান থেকে পাহাড় নেমে গেছে নীচের উপত্যকা পর্যন্ত একেবারে খাড়া। পাথরের গা কেটে রাস্তা ডাইনে বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে যেন পাতালপুরীতে। পাতালের মধ্যে পড়ে রয়েছে কৃশাঙ্গী 'আরডাল' ফিয়োর্ড—তার জল দেখাচ্ছে যেন কালির মতো। ফিয়োর্ড-এর জলে রোদ নেই, কিন্তু তার কোলে 'ফারনেস' গ্রাম রোদে ঝলমল করছে। নিখুঁত অপরূপ চিত্র।

ভিজে কাপড়ে শীত করছিল বলে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলুম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছলুম 'ফারনেস্' গ্রামে। সন্ধ্যা আগত। তা ছাড়া ভিজে কাপড় ছাড়া দরকার, গরম কিছু খাওয়া দরকার। তাই সেদিন 'আরডাল' যাওয়া স্থগিত রাখতে হল।

একটা সরাইখানায় এসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা খাবার ঘরে বসে গেল এক পেয়ালা গরম কফি নিয়ে। গাড়ি ভাড়া সম্বন্ধে কোন কথাই বললে না। আমরা একবার ভাবলুম ভাড়ার কথাটা তুলি। তারপর ভাবলুম, কে জানে ট্যাক্সিওয়ালারাও তো কতবার আমাদের লাফা-যাত্রায় সাহায্য করেছে। ভাড়ার কথাটা ও নিজে তোলে কিনা দেখা যাক। এই ভেবে আমরা কাপড় ছাড়তে চলে গেলুম। তারপর শুকনো কাপড় পরে দু-গামলা প্রায়-ফুটন্ত জল নিয়ে পা ডুবিয়ে বসলুম বৃষ্টিতে ভেজার ঠাণ্ডা-লাগাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যে।

পা ডুবিয়ে বসে আছি, এমন সময় খাবার ঘরের চাকর এসে আমাদের হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালার বিল। কাগজের

উপরে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে—মাঝপথ থেকে ফারনেস্ পর্যন্ত আসার ট্যাক্সি ভাড়া আট টাকা।

যাক, এতক্ষণ পরে তাহলে সব সংশয়ের অবসান। আমরা খুশী হয়ে ভাড়াটা চুকিয়ে দিলুম। মাঠের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে থেকে এমনভাবে যে আমাদের উদ্ধার করেছে সে পরম উপকারী। তা ছাড়া এতটা রাস্তার ভাড়া নিয়েছে নামমাত্র, খুব সম্ভব শুধু পেট্রোলের দামটা।

সরাইখানায় সে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল ন'টার সময় 'আরভাল' গ্রামের উদ্দেশে বেরতে যাবো, দেখি 'আরভাল'-গামী একটা স্টীমার ফিয়োর্ডের জলে দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে বাঁশী বাজছে। এখনই ছাড়বে। এ লোভ সংবরণ করা শক্ত হল। ফিয়োর্ডের জলে স্টীমার-যাত্রা না করে গেলে নরওয়ে-ভ্রমণই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উঠে পড়লুম স্টীমারে। নীরব নিথর ফিয়োর্ড-এর জল। কত গভীর কে জানে? দুধারে 'গ্র্যানাইট'-এর খাড়া পাহাড় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের গা সবটাই ন্যাড়া, চুড়োর কাছে শুধু দেখা যায় সবুজের ফালি—সেখানে দুটি একটি চিল উড়ছে। জল কেটে কেটে চললো স্টীমার। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌছে গেলুম আমরা 'আরভাল' গ্রামে।

এইখান থেকেই আবার আমাদের হাঁটা শুরু করবার ইচ্ছে ছিল। মনে করেছিলুম ফিয়োর্ড-এর এক পাশের পাহাড়ের প্রাচীরে চড়ে ফিয়োর্ড ধরে চলবো যতদূর যাওয়া যায়। এক পাশে থাকবে গভীর খাদ, তার নীচে ফিয়োর্ড-এর স্থির জল; অন্যদিকে ঢেউ খেলানো নরওয়ের পর্বতভূমি। কিন্তু কল্পনা করা আমাদের পক্ষে যতটা সহজ হয়েছিল, কাজের বেলায় দেখলুম ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব।

'আরভাল' গ্রামের আশে পাশে প্রায় সারাদিন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম, কোনদিক দিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা সহজ হবে। পাহাড়গুলো বিষম খাড়াই। কোন কোন জায়গা প্রায় দেয়ালের মতো। তাহলেও

একদিকের পাহাড়ে প্রায় অর্ধেকটা উঠে পড়লুম। যেখানে এসে পৌঁছলুম সেখানে দেখি পাহাড়ের গায়ে শ'খানেক খাঁচা এবং প্রত্যেক খাঁচার মধ্যে একটি দুটি করে শেয়াল। কয়েকটা ফাঁদও চোখে পড়ল।

মিরেককে জিজ্ঞেস করলুম—মিরেক, এরা কি শেয়াল-টেয়াল খায় নাকি?

মিরেক ভাল করে দেখে বললে—এগুলো তো মনে হচ্ছে উত্তর ইয়োরোপের 'রূপোলী শেয়াল'। দেখছো না কেমন সাদাটে ছাই-ছাই রং! নিশ্চয়ই এখানে এদের ধরে কোনো ব্যবসায়ী চালান দেয়। এদের মেরে চামড়া শুদ্ধ লোম বিক্রি করে। বড়লোকের গিন্নীরা কেনেন গলায় ঝোলাবার জন্যে।

আমি বললুম—বুঝেছি। 'ফার্' তৈরী হয় এদের মেরে।

লক্ষ্য করে দেখলুম চমৎকার রেশমের মতো নরম এদের লোম। ল্যাজটা সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু এই লোমশ শেয়ালগুলিকে বন্দী অবস্থায় দেখে বড় কষ্ট হল। আমরা সেখান থেকে চলে গেলুম।

আবার উঠতে লাগলুম পাহাড়ে, কিন্তু আর বেশীদূর এগোতে পারলুম না। শিলা-প্রাচীর দুর্জয়, দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। কোনো দিক দিয়েই দেখলুম ওঠবার আর কোনো রাস্তা নেই। কাজেই নীচে নেমে আসতে হল। গ্রামে ভাল করে খোঁজ নিলুম, আমরা যে-ভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে ফিয়োর্ড-এর ধার ধরে হাঁটতে চাই তা সম্ভব কিনা।

একজন বুড়ো জেলে আমাদের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হেসে দূর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লে—ঐ যে দেখছ কালো কালো চিলগুলো, ওদের মতো যদি উড়তে পারো, তবেই পারবে।

আর সকলে আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে জেলেদের এই গ্রাম থেকে বেরবার দুটি মাত্র পথ আছে, এ ছাড়া আর কোনোদিকে যাবার কোনো রাস্তাই নেই। দুটিই জলপথ। প্রথম, যেদিক দিয়ে আমরা এলুম স্টীমারে করে ফারনেস্ থেকে। দ্বিতীয়, সামনে পড়ে রয়েছে যে ফিয়োর্ড তাই। সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়া চলে।

আরো খবর নিয়ে জানলুম ফিয়োর্ড-এর পথে 'মিরডাল' বলে একটি গ্রাম পড়বে—সেখান থেকে হাঁটা-পথ গেছে পাহাড়ের পিঠে। কাল সকাল ছ'টায় ছাড়ছে একটা স্টীমার, তাতে করে যাওয়া যেতে পারবে 'মিরডাল' পর্যন্ত।

মিরেক বল্লে—এতো দেখছি দ্বীপে এসে পড়লুম।

বুড়ো জেলে হেসে বললে—থেকে যাও আজকের মতো এই দ্বীপের সরাই-খানায়। চলো, তোমাদের নিয়ে মাছ ধরে দিনটা কাটানো যাক। আসবে নাকি? বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মাছ ক'দিন ধরে একেবারেই পড়ছে না। আজ যদি পড়ে তো ভেজে খাওয়াবো বলে রাখলুম।

আমরা এ প্রস্তাবে পরম উৎসাহে রাজি হলুম। ঘাটে অন্তত শ'খানেক জেলেদের নৌকো বাঁধা পড়ে রয়েছে। কেউ আজ মাছ ধরছে না। বুড়ো জেলে আমাদের নিয়ে তার নড়বড়ে ডিঙিতে তুললো এবং তার পুরুষ্টু হাতে ছপ্ ছপ্ করে সমান তালে দাঁড় বেয়ে নিয়ে চললো মাঝ-দরিয়ায়। গ্রাম থেকে মাইলখানেক গিয়ে বুড়ো একজায়গায় নৌকো থামাল। তারপর পাটাতনের নীচে থেকে তার স্থতো আর বঁড়শী বার করলে। টোপ দিলে একটা চক্‌চকে টিনের মাছ। মাছের ল্যাজের কাছে ছোট্ট একটি চাকা। জলে ফেলে স্থতো ধরে টানলেই মাছটা ঘুরতে থাকে। ছিপ টিপ কিছু নেই। হাতে করে স্থতো ধরে বুড়ো বললে—এইবার তোমাদের একজন নৌকো বাও। চলো গ্রামের দিকে।

আমি তখন দাঁড়ে বসলুম, বুড়োর হাতে রইল হাল এবং স্থতো। মিরেক মাঝখানে বসলো দ্রষ্টা হয়ে। নৌকো চললো আর বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকলো টিনের টোপ। গ্রাম পর্যন্ত আমি নৌকো বেয়ে নিয়ে এলুম, কিন্তু কোনো মাছ গাঁথা পড়ল না।

বুড়ো তখন আবার ডিঙি নিয়ে চললো যতদূরে আমরা গিয়েছিলুম তত-দূরে। এবার মিরেকের পালা। মিরেক দাঁড় বাইতে লাগল, বুড়ো রইল স্থতো ধরে। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি, ধরে নিয়েছি এ যাত্রাতেও মাছ

উঠলো না, এমন সময় ঘ্যাঁচাং করে এক টান। দেখি বুড়ো একটা মাছ গেঁথে ফেলেছে। তারপর তাকে খেলিয়ে নৌকোয় তুলতে আর কতক্ষণ? প্রকাণ্ড মাছ। ওঃ, বুড়োর সে কি উত্তেজনা। আমি বললুম—বুড়ো, অত লাফিও না। শেষকালে নৌকো শুদ্ধ উল্টে যাবে। আমি আবার একেবারেই সাঁতার জানি না।

শুনে বুড়ো ঠাণ্ডা হল। ফোঁকলা দাতে মাড়ি বার করে হাসতে হাসতে বললে—তোমরা বড় ভাগ্যবান। ক'দিন ধরে গ্রামের কেউ একটি মাছ ধরতে পারেনি। চলো এবার তোমাদের সরাইখানায়। এটাকে ভেজে দি। আমায় এক টুকরো দেবে তো?

আমরা বললুম—কি আশ্চর্য। মাছ তো সবটাই তোমার। এক টুকরো আবার কি?

বুড়ো বললে—না, না, তা কি হয়? তোমাদের হাতযশে মাছ উঠেছে, এ মাছ তোমাদের। চল এখন সবাই মিলে আমোদ করে ভোজন করা যাক্।

সংসারে বুড়োর কেউ নেই। কিন্তু গ্রামের সবাই তাকে ভালবাসে। সরাইখানার সকলেই তাকে ভালো করে চেনে। সব জায়গায় বুড়োর অবাধ গতি—সরাইখানার রান্নাঘর পর্যন্ত। বুড়োর উল্লাসে অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট গ্রামের প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষ জেনে গেল যে দু'জন বিদেশী যাত্রী আসার ফলে ফিয়োর্ডের মাছেরা আজ তিনদিন পরে আবার ধরা দিতে আরম্ভ করেছে।

বাঁ হাতে করে মাছটা দোলাতে দোলাতে এবং আমরা আসার ফলে যে সরাইখানার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে ডান হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই কথা সবাইকে জানাতে জানাতে বুড়ো সোজা রান্নাঘরে ঢুকে মাছ ভাজতে শুরু করে দিলে।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেদিন জেলে-বুড়ো, সরাই-এর ঝি এবং জেলে-বুড়োর আর দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে ফিয়োর্ডের সুস্বাদু মাছ খেলুম।

॥ ১৬ ॥

তারপর দিন ভোরে উঠে তৈরী হয়ে নিলুম আমরা স্টীমারের জন্যে। ঠিক ছ'টার সময় স্টীমার ছাড়ল। কফিটফি খেয়ে ডেকের উপর গিয়ে বসলুম ফিয়োর্ডএর দৃশ্য উপভোগ করতে। কি আঁকাবাঁকা যে পথ, আর ফিয়োর্ডএর মধ্যে কত যে অলিগলি তা এইরকম একটা জলযাত্রা না করলে বোঝা যেত না। জলপথ সব সময় বক্রপথে চলেছে। আসলে যদিও একটানা জলরেখা, কিন্তু সামনে বা পিছনে কোন সময়েই বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। তাতে সব সময়েই মনে হয় একটি ছোট্ট হ্রদের মধ্যে রয়েছি। ফিয়োর্ডএর মাঝে মাঝে জেলেদের বসতি—কখনও এপারে, কখনও ওপারে। জলপথ ছাড়া তাদের আর কোন যোগাযোগ নেই। দুপাশে আকাশস্পর্শী মসৃণ পাথরের দেয়াল—সেখানে কোন রাস্তা কোন সুঁড়ি-পথও নেই। স্টীমার এগিয়ে চলে, আর তার জল কেটে চলার শব্দ, তার বাঁশীর শব্দ দুপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বার বার ফিরে আসে। বেশীদূরে শব্দ চলে না, বেশীদূরে দৃষ্টি চলে না, মনও বেশী দূরে যেতে চায় না। এমন একটা ঘরোয়ানা শান্ত পরিবেশ যে মনে হয় এখানে কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়া নেই—সবাই সবার সঙ্গে গলাগলি হয়ে আছে।

এইভাবে চলতে চলতে বেলা ঠিক একটার সময় স্টীমার 'মিরডাল' গ্রামে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল। আমরা হ্রদের ধারে বসে চট্ করে স্টোভে রান্না চড়িয়ে দিলুম।

য়োটুনহাইমের যে ম্যাপ আমরা এনেছিলুম, এ জায়গাটা ঠিক তার বাইরে। যে রাস্তাটা এখান থেকে সুরু হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে গেছে, সেটা ধরে চললে কোথায় গিয়ে পৌছব, তা জানি না। এইরকম

নিরুদ্দেশ যাত্রা করা উচিত হবে কিনা মিরেক আর আমি তাই বিবেচনা করছি, এমন সময় দেখি পিঠে পিঠঝুলি নিয়ে দু'টি চরণিক আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছে। দুটি মেয়ে—স্টীমারে এদের দেখেছিলুম। আমরা তাদের থামালুম। জার্মান ভাষায় কথা কইতে তারা জার্মান ভাষাতেই জবাব দিয়ে জানালো, তারা ইংরেজ। আমরা তখন জানতে চাইলুম, তাদের কাছে এ অঞ্চলের ম্যাপ আছে কিনা এবং পাহাড়ের উপর কোন আশ্রয়ের খবর তারা রাখে কি না।

একটা চমৎকার ম্যাপ তারা দেখালে, কিন্তু আশ্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারলে না। কারণ তারা হাল্কা তাঁবু নিয়ে ঘুরছে—বনের পাশে বা ঝরনার ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাচ্ছে। আশ্রয়ের সমস্যা তাদের নেই।

যাই হোক, ম্যাপে আমরা দেখলুম, পাহাড়ের উপরে রেলের লাইন গিয়েছে, এবং 'মিরডাল' নামে একটা স্টেশানও আছে। এইটুকু খবরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিছু না হোক স্টেশানেও তো রাত কাটানো যাবে।

কাজেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম তাড়াতাড়ি। ফিয়োর্ড সংলগ্ন পাহাড়, সুতরাং খুব চড়াই। উঠতে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে উঠতে হয়, দম নিয়ে নিয়ে। অন্য কোন পাহাড়ে উঠতে হলে হয়তো আমাদের থেকে থেকে ধৈর্যচ্যুতি হতো। কিন্তু এখানে তা মোটেই হল না। 'মিরডাল' উপত্যকার মোড়ে মোড়ে ঝরনা। এত সুন্দর তার আকৃতি এত চমৎকার পাথরের বিন্যাস আর কুলু কুলু রব যে ঝরনা নিয়েই মন মেতে থাকে। একটা ঝরনার শব্দ মিলিয়ে যেতে যেতেই আর একটা ঝরনা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়টা সব সময় মনে হয় প্রথমটার চেয়েও সুন্দর।

এক নাগাড়ে চার ঘণ্টা পাহাড় ভেঙে অবশেষে চূড়োয় এসে আমরা পৌঁছলুম। জায়গাটা পাহাড়ের রাজ্য। এখান থেকে অবিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণী ঢেউএর মতো চলে গেছে, যতদূর চোখ যায় ততদূর। তাদের চূড়োগুলি সারা বছরই বরফে সাদা। আমরা যেখানে উপস্থিত হলুম, সেটা সমুদ্র-পৃষ্ঠ

থেকে চার হাজার ফিট উঁচু হবে। সেখান থেকে পর্বত-গাত্র, নীচের উপত্যকা, আরডাল ফিয়োর্ড, সব কিছু ছবির মত দেখায়—বড় মনোহর।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমাদের আস্তানা খুঁজতে বেরতে হল। একটা পাহাড়ী গ্রাম সেখানে আছে, কিন্তু গ্রামে কোন সরাইখানা আছে কিনা সন্দেহ। জিজ্ঞাসুর মতো আমাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইলে আমরা কোন সাহায্য চাই কি না। মেয়ে দুটির মধ্যে একটি জার্মান, একটি 'সুইস্'।

আস্তানার কথা জিজ্ঞেস করতে তারা বললে, স্টেশানের কাছে একটা হোটেল আছে, কিন্তু সেটা মহার্ঘ্য।

আমরা বললুম, তাহলে আমাদের পোষাবে না। কোন সরাইখানা নেই?

তারা বললে—নেই। তারাও দুটি চরণিক, দুপুরে এখানে এসে পৌঁচেছে এবং থাকার জায়গা নিয়ে আমাদেরই মতো মুশকিলে পড়েছিল। শেষে একজন ভেড়া-ওয়ালার বাড়িতে সস্তায় থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পরিষ্কার বাড়ি—সে বাড়িতে আরো ঘর আছে, খুব সম্ভব আমরা চাইলে পাবো। তা ছাড়া গরুর দুধ, চাষাড়ে মাখন-রুটি আর ভেড়ার পনির খেতে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তা-ও আমরা পেতে পারি।

আশ্রয়-সমস্যা এমন সুষ্ঠুভাবে মিটে যাবে, আমরা ভাবিনি। ভেড়া-ওয়ালার বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বাড়ির নীচের তলায় ভেড়া থাকে, উপরতলায় থাকে মানুষ। প্রচুর ঘর, তার থেকে দুখানা আমরা বেছে নিলুম। ভেড়াওয়ালার বাড়িতে খাবার টেবিলের চারপাশে চারজন অভিজ্ঞ চরণিক বসে পরস্পরের অভিজ্ঞতার নানা গল্প করে সেদিনের সন্ধ্যাটা বড় চমৎকার কাটল।

মেয়ে দুটি লাফা-যাত্রায় দেখলুম সকলকে টেক্কা দিয়েছে। দুজনেই তারা সুইজারল্যাণ্ডের 'জুরিখ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। গ্রীষ্মের ছুটিতে জার্মানীতে* বেড়াচ্ছিল লাফা-যাত্রা করে। জার্মানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে

হল্যাণ্ডের সীমানায় যখন এসে পড়েছে, তখন একদিন একটা প্রকাণ্ড গাড়ি তারা থামাল। যাঁর গাড়ি, তিনি যাচ্ছেন হল্যাণ্ডের 'রটারডাম' শহরে। মেয়ে দুটির হল্যাণ্ডে যাবার কোন প্ল্যান ছিল না। কিন্তু এক লাফে 'রটারডাম' যাবার লোভ তারা সংবরণ করতে পারলে না—বিশেষ করে অমন একটা সুন্দর গাড়িতে। পথে যেতে যেতে তারা শুনলে চালক ভদ্রলোক তার পরদিন তাঁর ছোট্ট এরোপ্লেনে করে নরওয়ে যাচ্ছেন। নিজেই 'পাইলট'। মেয়ে দুটিকে বললেন—তোমরা ইচ্ছে করলে আসতে পার, 'প্লেনে' জায়গা আছে। মেয়ে দুটি কোনরকম দ্বিধা না করে তখনই রাজি হয়ে গেল। বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দিলে—নরওয়ে চললুম। সুইস্ মেয়েটির মা তো টেলিগ্রাম পড়ে প্রায় অজ্ঞান। জার্মান মেয়েটি বললে—আমার বাড়ির কেউ অজ্ঞান হয়নি বটে, তবে সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের চিঠি পেয়ে জানলুম। সেই থেকে এরা দুজনে নরওয়েতেই ঘুরছে। এদের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার বাড়ি ফেরবার পালা।

আমরা বললুম—তোমাদের মতো আমাদের যদি দ্রুত মনস্থির করবার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে এতক্ষণ আমরা হয়তো উত্তর মেরুতে। বলে আমাদের সেই 'ফিনমার্ক' গামী গাড়ি থামানোর গল্প বললুম।

—কিন্তু তোমাদের মতো এরোপ্লেনে লাফা-যাত্রা, এ আমরা কোথাও শুনিনি।

মেয়ে দুটি বললে—এরোপ্লেন তো হল। এখন 'বারগেন' বন্দর থেকে জার্মানীর 'হামবুর্গ' বন্দর পর্যন্ত একটা জাহাজকে যদি হাত তুলে থামাতে পারি, তবেই এ যাত্রাটা সম্পূর্ণ হয়।

আমরা আশীর্বাদ করলুম—স্থল এবং আকাশ-পথের মত জলপথেও তোমাদের লাফা-যাত্রা সফল হোক।

পরদিন সকালবেলা উঠে যখন স্টেশানে যাচ্ছি, পথে সেই দুটি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে দেখা।

'সুপ্রভাত' জানাতেই তারা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় চললেন আপনারা?

আমরা বললুম—কোথায় আর যাবো? স্টেশানে চলেছি, দেখি সুবিধে-মতো ট্রেন কিছু পাই কি না।

—সে কি? হাঁটবেন না এ অঞ্চলে আর? ভারি সুন্দর জায়গা যে!

আমরা বললুম—ম্যাপ কোথা পাবো? আমাদের তো ম্যাপ নেই। য়োটুনহাইম্-এর ম্যাপ এনেছিলুম, সে তো শেষ হয়ে গেল।

তারা বললে—আমরা কয়েকদিন এখানে ঘুরব। আমাদের কাছে পায়ে-চলা পথের ম্যাপ আছে। আপনাদের বলতে পারতুম আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে, কিন্তু আপনাদের যে তাঁবু নেই, থাকবেন কোথায়? এ অঞ্চলে গাছতলা ছাড়া আর কোন আশ্রয়ই নেই।

—কাল কোথায় ছিলেন আপনারা?

—ঝরনার ধারে।

—যদি বৃষ্টি আসতো?

—দেখেন নি বুঝি আমাদের তাঁবু? দেখুন—এক ফোঁটা জল ঢোকবার উপায় নেই—অথচ কত হাল্কা। খাটাতে সময় লাগে ঠিক পাঁচ মিনিট। এই দেখুন আমাদের 'স্লীপিং ব্যাগ'—লোম দিয়ে ঢাকা। কত গরম দেখছেন? বরফ পড়লেও শীত করে না। এ দিয়ে 'আল্প্স' জয় করা যায়।

—এত জিনিস, এর উপর আবার খাবার, থালা, বাসন, উনুন। পিঠঝুলি ভারি হয় না?

—তা হয়। সেই কারণে আমরা তো সারাদিন হাঁটি না, একবেলা হাঁটি। অন্য চরণিকরা দিন-ভর যতটা রাস্তা যায়, আমরা যাই তার অর্ধেক, কিন্তু বেড়ানোর মজা উপভোগ করি দ্বিগুণ।

চরণিক জীবনকে যে আর একটা দিক দিয়ে দেখা যায়, এদের কাছে শিখলুম। আমাদের স্বীকার করতেই হল মেয়ে দুটি প্রচুর বুদ্ধিমতী। চরণিকের পক্ষে ক'মাইল হেঁটেছি, সেটা বড় কথা নয়; হাঁটাটা কতটা উপভোগ করেছি সেইটাই আসল।

এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা স্টেশানে গেলুম। প্রথমেই খোঁজ

করলুম মোটারের রাস্তা এখান থেকে কতদূর। খোঁজ নিয়ে জানলুম ট্রেনে করে ঘণ্টা দুই গেলে 'গল্' নামে একটা স্টেশন পড়বে, সেখান থেকে অস্‌লো পর্যন্ত মোটারের রাস্তা আছে।

আমাদের ছুটির বারো আনাই ফুরিয়ে গেছে। বাকি আছে চার আনা। নরওয়ের য়োটুনহাইম্ পাহাড়ে পিঠঝুলি নিয়ে হাঁটবো বলে বেরিয়েছিলুম, তা হয়েছে। একটা ম্যাপ পেলে এ অঞ্চলেও দু'চার দিন হয়তো হাঁটতুম, কিন্তু তা যখন নেই তখন 'গল্' থেকে সোজা লাফা-যাত্রা করে কোপেনহাগেন পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলুম—এও তো আর একরকম হাঁটা।

বেলা বারোটার সময় ট্রেন এলো। নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের প্রধান শহর 'বার্গেন' থেকে নরওয়ের পুর্ব উপকূলে অস্‌লো যাবার ট্রেন। 'বার্গেন'ও সমুদ্রকূলে, অস্‌লোও তাই, কিন্তু দুই নগরকে জুড়েছে যে রেলপথ, তাকে উত্তুঙ্গ পর্বত পার হয়ে যেতে হয়েছে। সমভূমি থেকে উঠতে উঠতে শৈলশিখরে পৌঁছে তারপর আবার সমভূমিতে নেমে আসা এই হচ্ছে এই লাইনটির বিশেষত্ব। সুতরাং সারা পথই বৈচিত্র্যময়। সুশ্যামল পর্বতভূমি থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তুষার রাজ্যে উপনীত হলুম। চারিদিক সাদায় ছেয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেখলুম বিরাট তুষার-স্তূপকে সরিয়ে ঝেঁটিয়ে রেলের রাস্তাকে চালু রাখা হয়েছে। প্রখর গ্রীষ্মে যেখানে এইরকম ব্যাপার, সেখানে শীতের সময় কি কাণ্ড হয় ভেবে অবাক লাগল। ট্রেন চলতে লাগল একটার পর একটা লম্বা লম্বা 'টানেল' পার হয়ে। প্রত্যেক বারেই এপারে যতটা বরফ দেখে টানেলের মধ্যে ঢুকি, ওপারে টানেল থেকে বেরিয়ে দেখি বরফ আরো যেন বেশী। ক্রমে বরফে চারিদিক একাকার হয়ে যায়। আমাদের শীত করতে থাকে। কামরার তাপযন্ত্র পুরোমাত্রায় চালিয়ে দিয়ে কাঁচের দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। ঘাস, পাতা, ফুলের কুঁড়ি, পাখী, পাখালী, গ্রীষ্মের যাকিছু সম্পদ সব মনের থেকে মুছে যায়। মনে হয় যেন এক ঝটকায় পাঁচ-ছ'টা মাস এগিয়ে গিয়ে বড়দিনের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

তারপর আমরা যে স্টেশনে থামি, তার নাম হচ্ছে 'ফিন্‌সে'। বার্গেন থেকে অস্‌লোর রেলপথে এই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্থান।

আমাদের কামরার মধ্যে আমি আর মিরেক ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি এতক্ষণ কোন কথা কন নি। 'ফিন্‌সে' স্টেশানে গাড়িটা থামতে তিনি একবার জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে স্টেশানের মাইক্রো-ফোনে কি বলছে শুনে নিলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন—গাড়ি এখন এখানে দেড় ঘণ্টার মতো আটকা পড়ল। সামনের রেলপথ তুষার-ঝড়ে চাপা পড়েছে—তাই এখন পরিষ্কার হচ্ছে। যতক্ষণ না বরফ সরানো হয় আমাদের নড়বার যো নেই।

আমি বললুম—বাঃ, তাহলে তো বাইরে গিয়ে বেশ একটু বেড়িয়ে আসা যায়—কি চমৎকার দৃশ্য।

পিঠঝুলির মধ্যে যে কটা জাম্পার, স্কার্ফ, মোজা, টুপি ছিল, সব পরে ফেললুম, তারপর সেই অদ্ভুত সাজে সেজে তুষার-অভিযানে বেরিয়ে পড়লুম আমরা।

মিরেক আর আমি প্ল্যাটফরমে হাঁটছি, এমন সময় আমাদের কামরার সেই ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে বললেন—নরওয়ের রাজার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়েছে ? রাজা 'হাকন্‌' ?

—কই না তো ?

—পরিচয় করতে চান ? তাঁরা এই ট্রেনেই যাচ্ছেন। রাজা এবং যুবরাজ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন—ঐ যে।

অনেকদূরে ইঞ্জিনের কাছে ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে দেখালেন। বরফ-ঝরা ঝাপসা আকাশের মধ্যে দিয়ে দুটি মূর্তি চোখে পড়ল। আমরা এগিয়ে চললুম। তখন ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি রাজারই একজন অনুচর—ভ্রমণের সময় রাজার সুখ-সুবিধা দেখেন। নরওয়ের রাজা আড়ম্বর ভালবাসেন না—যে কোন প্রজা তাঁর কাছে যেতে পারে। নরওয়ের লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে প্রচুর।

মিরেকের কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনকার দিনে আমাদের দেশে ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার কথা সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারত না। পুলিশের পাহারা, ধমকের ভয়, লাঠির ভয়, অপমানের ভয়—এই সব পেরিয়ে তবে রাজপুরুষ দর্শন। তাই নরওয়ের রাজ-অনুচর যখন ফস্ করে আমাদের রাজ-সমীপে উপস্থিত করলেন এবং রাজা ও যুবরাজ অনায়াসে হাত বাড়িয়ে আমাদের হাতে হাত দিলেন, তখন অস্বীকার করব না, আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। রাজার মধ্যে আর আমার মধ্যে যে কোন দূরত্ব নেই, সেটা ভাবতে কেমন অস্বাভাবিক লাগল। যাই হোক্, অনুভূতিটা ক্ষণিক। রাজা এবং যুবরাজের গলার স্বরে হঠাৎ আমার আড়ষ্ট মনোভাব কেটে গেল। তখনই আমি বুঝে ফেললুম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা, তা সে মহারাজাই হোক, আর প্রজাই হোক, সহজ এবং স্বাভাবিক।

আমরা বরফের মধ্যে বেড়াতে যাচ্ছি শুনে রাজা হাকন্ তাঁর অনুচরের দিকে ফিরে বললেন—যাও না তুমি এঁদের নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও না। স্থানীয় লোক যখন তুমি, তোমাদের এটা কর্তব্য।

আমাদের দিকে ফিরে বললেন—এঁর বাড়ি এখানেই।

লোকটি মাথা নীচু করে বললেন—আমি কৃতার্থ হব।

আমরা তখনই বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে।

ভদ্রলোক বললেন—কোন দিকে যাবেন? গ্রামের দিকে না পাহাড়ে?

আমরা বললুম—পাহাড়ে।

পাহাড়ের কুঞ্জপৃষ্ঠে গিয়ে আমরা উঠলুম। বরফে ঢাকা নেড়া পাহাড়। কোনদিকে বন নেই, গাছ নেই, একটি ডাল পর্যন্ত নেই। বনের সীমানা অনেক নীচে ছেড়ে এসেছি। সাদা তুলোয় ঢাকা পথের একমাত্র বৈচিত্র্য হচ্ছে, কোন জায়গা উঁচু, কোন জায়গা নীচু, কোন জায়গা ডাইনে বেঁকেছে, কোন জায়গা বা বাঁয়ে। স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা চলেছি, বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি, স্টেশনের দোতলা বাড়িটা আর দেখতে পাচ্ছি না,

এমন সময় হঠাৎ আমাদের তিনজনেরই একসঙ্গে চোখে পড়ল বরফের উপর একজোড়া টাটকা শী-এর দাগ। রাস্তার একপাশ থেকে এসে রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশে চলে গেছে। ভদ্রলোক একটু মনোযোগ দিয়ে দাগটা দেখে বললেন—একটি ছোট ছেলের শী-এর দাগ, দেখছেন না কত সরু। এসেছে রাস্তার ডানদিক থেকে, গেছে বাঁদিকে। টাটকা দাগ—খুব বেশীক্ষণ হল যায় নি।

আমি বললুম—চলুন না, দাগ ধরে যাওয়া যাক। হয়ত ছেলেটির দেখাই পেয়ে যাবো।

—যাবেন ? চলুন।

আমরা তখন রাস্তা ছেড়ে কাঁচা বরফের উপর দিয়ে চললুম। দাগটা প্রায় সোজা সরলরেখায় চলেছে। সমান্তরাল ফিতের মতো দুটি রেখা বরফের মধ্যে মোলয়েমভাবে বসে গেছে, দু'ইঞ্চি গভীর। গরুর গাড়ির চাকার দাগের দুপাশে যেমন মাটি উঁচু হয়ে থাকে, তেমনি মাটির বদলে এক্ষেত্রে দোবারা চিনির মতো গুঁড়ো বরফ।

অনেকদূর এগিয়ে গেছি। ভদ্রলোক বেশ তারিফ করে বলছেন—বাঃ, চমৎকার শী করতে পারে তো। একটুও বেঁকেনি, একটু হোঁচট খায়নি, একটু হেলেনি পর্যন্ত—ছেলেটা গেল কোথায় ?

এই বলবামাত্র তিনি হঠাৎ এমন থমকে দাঁড়ালেন যে, আমি আর মিরেক চমকে উঠলুম। ভদ্রলোক দেখলুম নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ দাগের দুপাশে বরফের উপর কি যেন পর্যবেক্ষণ করছেন।

আমাদের চোখে পড়ল, এ জায়গাটার বরফ চারিদিকে ছড়ানো—একটা পড়ে-যাওয়ার স্পষ্ট ছাপ। ছেলেটি যে এইখানে একটা আছাড় খেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার সমান্তরাল রেখা কাটতে কাটতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হয়ে দেখবার কি আছে, আমরা বুঝলুম না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে তারপর একটু হেসে বললেন—

একটা ভারি মজার জিনিস লক্ষ্য করছি। এই দেখুন বরফের উপর যেখানে ছেলেটি পড়ে গেছে, তার থেকে এই দেখুন একটু দূরে এই গভীর নিরেট গোলমত ছাপটি। এটি লক্ষ্য করেছেন ?

আমরা আগে দেখিনি, এইবার দেখলুম।

ভদ্রলোক বলে চললেন—এই ছাপটি কোথা থেকে এল ? ছেলেটিই উঠতে গিয়ে কোনরকমে এই ছাপটি করেছে, না অন্য কেউ করেছে ?

মিরেক বাধা দিয়ে বললে—অন্য কে আবার করবে ? এখানে তো আর কারো পায়ের চিহ্নই নেই। নিশ্চয়ই উঠতে গিয়ে তার হাত-টাত দিয়ে অথবা তার লাঠি দিয়ে ছেলেটি নিজেই এই দাগটি করেছে।

ভদ্রলোক বললেন—খুব সম্ভব আপনি যা বলছেন তাই ঠিক। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই দাগটা দেখে আমার কেবল সেই কথাই মনে পড়ছে। আমাদের যদি আরো খানিকটা সময় থাকতো, তাহলে আরও এক মাইল এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতুম—স্কী-এর চিহ্নের পাশে ঐ রকম গোল গোল দাগ আরো দেখতে পাওয়া যায় কি না। আমাদের কিংবদন্তীতে অন্তত তাই বলে।

ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন—কিন্তু আর এগোনো যায় না। ফিরে যেতে যেতেই ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে যাবে। রাজাকে ফেলে পালাবার উপায় আমার নেই। চলুন তাড়াতাড়ি ফেরা যাক।

আমি বললুম—কিংবদন্তীটা কি ?

ভদ্রলোক বললেন—চলুন বলছি।

॥ ১৭ ॥

আমরা তখন ফিরতি-পথ ধরলুম। ভদ্রলোক বলতে থাকলেন—

এই অঞ্চলে শোনা যায় বহুদিন আগে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, তার নাম ছিল পেআর। ছেলেটি ছিল বড়ই গরীব, পিতৃমাতৃহীন। দু-বেলা

দু-মুঠো খাবার জন্যে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজের খোঁজে ঘুরতে হত। কখনো তার কপালে জুটতো ভাল মনিব; আবার যখন জুটতো খারাপ মনিব তখন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তাকে খাটতে হত।

পেআর-এর বয়স যখন ন-বছর তখন সে একবার গ্রীষ্মকালে এক চাষীর বাড়িতে কাজ পেলে। সেই চাষীর বৌ-এর রক্তে দয়া-মায়া বলে কোনো জিনিসই ছিল না। অন্ধকার থাকতে উঠে পেআরকে খাটতে শুরু করতে হতো; সকলে শুয়ে পড়বার পরে তবে তার ছুটি। এর মাঝে একতিল বিশ্রাম নেই। সারাদিন চাষীগিন্নীর মুখ দিয়ে একটি মিষ্টি কথা বেরুত না, বরং পদে পদে খালি অনুযোগ আর খুঁত ধরা।

—ওরে কুঁড়ের বাদশা, এক বাণ্ডিল কাঠও কেটে রাখতে পারিসনা? এদিকে চুলো যে নিভে এল। যা শিগগির কাঠ নিয়ে আয়। গরুর দুধ এমন পাতলা হচ্ছে কেন? ভালো করে গরুকে খাওয়াতেও জানিসনে উজবুক কোথাকার! মুরগীর ডিম এত ছোট হয় কেন? নিশ্চয় হতভাগাটা মুরগীর দানা সময় মতো দিচ্ছে না।

এইভাবে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি চলতো। শেষে পেআর বেচারা আর সহ্য করতে পারলে না। একদিন ভোর না হতে উঠে সে চুপিচুপি সেই চাষীর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল যে দিকে গভীর বন সেই দিকে। সঙ্গে সে কিছুই নিলে না, শুধু ছোট্ট একটি কাঠের বালতি। পথ চলতে সে বুনো বেরী তুলে বালতিতে ভরতে থাকল। এই হল তার সারাদিনের খাবার। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল, সে শুকনো এক গাছের শিকড়ের নীচে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়ল। বনের মধ্যে শুধু এক কুটুরে-প্যাঁচা ছাড়া আর কেউই তার আস্তানার খবর জানতে পেলে না। এইভাবে বনে বনে ঘুরে পেআরের দিন কাটতে লাগল। দেশ-জোড়া বন নরওয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে। বেড়িয়ে সে-বন শেষ করা বা খেয়ে সে বনভূমির বেরী শেষ করা ছোট্ট পেআরের কর্ম নয়। জীবনে এই প্রথম পরের জন্যে না খেটে পরের মুখ-ঝামটা না খেয়ে স্বাধীনভাবে চলে

বেড়াতে পেআরের ভালই লাগছিল। শুধু গভীর বনের মধ্যে তার বড় একা লাগত। তার না-ছিল কথা-বলার কোনো সঙ্গী, না-ছিল খেলার কোনো সাথী।

একদিন দুপুর বেলা পেআর রোদের মিঠে আলোয় বেরী কুড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। সেখানে এসেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল শেওলা-ঢাকা একটা প্রকাণ্ড পাথরে ঠেস দিয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় এক বিরাট 'ট্রল্' বসে রয়েছে।

—ট্রল্ কি জানেন তো? ট্রল হচ্ছে নরওয়ের দৈত্য। বনের ট্রল্, হ্রদের ট্রল্, নদীর ট্রল্, ঝরনার ট্রল্, ঝড়ের ট্রল্, মেঘের ট্রল্ নানা প্রকারের ট্রল্-এ ভরা আমাদের এই দেশ।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্যে ট্রল-এর কথা মিরেক আর আমি আগেই পড়েছিলুম। কাজেই আমরা বললুম—ট্রল-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, গল্প চলুক।

ভদ্রলোক বলে চললেন—

পেআর এমনই চমকে উঠল যে ভয়ে তার হাত থেকে বেরী-ভর্তি বালতিটা ঠক করে মাটিতে পড়ে গেল। সে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে রইল সেখানে খানিকক্ষণ। ভাবলে, ট্রলটা জেগে ওঠবার আগেই পা টিপে টিপে সরে পড়বে। কিন্তু যেই না সে এক পা বাড়িয়েছে অমনি শুনলো একটা প্রকাণ্ড হেঁড়ে গলা—

—পালিও না খোকা! দাঁড়াও একটু।

ভীষণ গলা যদিও, কিন্তু কেমন যেন নরম নরম স্বর। শুনে পেআর ফিরে দাঁড়াল। বুড়ো ট্রল্ তার কুৎসিত মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বললে—

ভয় পেও না, কাছে এস। তুমি আর আমি দুই বন্ধু হব। এই বনের মধ্যে আমার বড় নিঃসঙ্গ লাগে। সবাই আমায় দেখে ভয়ে পালায়।

শুনে পেআরের এমন মায়া করল, বুড়োর জন্যে এমন দুঃখ হল যে তার মনে ভয়ের আর কোনো চিহ্নই রইল না।

একটু পরেই দেখা গেল সে ট্রল্-এর হাঁটুর উপর বসে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ট্রল্ বললে—আমি এত বুড়ো হয়ে পড়েছি যে আজকাল আর চোখে ভাল দেখতে পাই না।

পেআর দেখল, তার বন্ধুর কপালের মাঝখানে একটিমাত্র চোখ। সে জানতো ট্রলদের চোখ ইচ্ছে করলে খুলে বার করা যায়। সে তাই বললে—দেখি তোমার চোখটা আমার হাতে একবার দাও তো।

ট্রল্-বুড়ো তার চোখটা খুলে পেআরের হাতে দিল। পেআর-এর প্রায় মাথার সমান সে জিনিসটা! পেআর বললে—এঃ চোখ ভরা দেখছি কাঠি আর কুটো। সারা চোখ তো শেওলায় ঢাকা—দেখতে পাওনা তার আর আশ্চর্য কি?

এই বলে সে সাবধানে কাঠি-কুটো পরিষ্কার করে কাছের একটা ঝরনায় চোখটাকে ধুতে নিয়ে গেল। ধুয়ে মুছে চক্‌চকে করে যখন সে ট্রল্‌কে চোখটা ফিরিয়ে দিলে তখন সেটা হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে।

বুড়ো ট্রল্ সেটা কপালের ফুটোর মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে বলে উঠল—বাঃ বাঃ কি চমৎকার! এ যে আমি দুশো বছর আগে যেমন দেখতে পেতুম তেমনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

পেআর মুখ হাঁ করে বললে—দু'শো বচ্ছর? তোমার বয়েস কত তাহলে?

বুড়ো বললে—তা আমার ঠিক মনে নেই, তবে তিন হাজার বছরের কম নয়।

পেআর তাজ্জব হয়ে বললে—বাপ্ রে বাপ্, তুমি তো তাহলে এই নরওয়ে দেশ যতদিন ততদিনের!

বুড়ো হো হো করে হেসে উঠল। তার হাসির আওয়াজ বাজ পড়ার শব্দের মতো এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল। তারপর দূরের পাহাড়ের পিছনে যেখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে

সেই দিকে তাকিয়ে ট্রল্ বললে—দেখ ভাই, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে সূর্য ডুববে। ঠিক সেই সময় ঐ যে ঝাপ্সা পাহাড় দেখা যায়, ওর পিছনে যে নদী তার জল থেকে বড় বড় মাছ লাফিয়ে উঠবে মাছি খাবার জন্যে। সেই হচ্ছে মাছ ধরবার উপযুক্ত সময়। অমন সুস্বাদু মাছ সারা দেশের মধ্যে কোথাও নেই। চল যাই।

পেআর বললে—সে কি, কোথায় কতদূরে ঐ পাহাড! সারা রাত সারাদিন হাঁটলেও ওখানে পৌছন যাবে না।

বুড়ো বললে—চুপটি করে বোসো দেখি আমার কাঁধের উপর। দেখ কি হয়।

পেআর বুড়োর কাঁধে চেপে বসল। তার মনে হল, সে যেন একটা পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছে।

বুড়ো খালি একবার শুধোলে—তৈরী তো?

পেআর বললে—হ্যাঁ।

তারপরই পেআর-এর চোখের সামনে পাহাড়, গাছপালা, আকাশ, মেঘ সব কিছু যেন ঝড়ের মুখে মিলিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সে দেখল পাহাড়ের অপর পিঠে নদীর কিনারায় তারা এসে হাজির হয়েছে।

পেআর কাঁধ থেকে নেমে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললে—দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কি? বাপ্রে এ রকম যে কেউ ছুটতে পারে আমার জানাই ছিল না।

বুড়ো বললে—রোসো এইবার মাছ ধরে দি। কিছু কাঠের যোগাড় করো তুমি ততক্ষণ।

পেআর দেখল চারিদিকে রসে-ভরা বড় বড় বেরী। এমন বেরী সে বনের মধ্যে আগে কোথাও দেখেনি। সে তখনই বেরী আর কাঠ সংগ্রহে লেগে গেল।

সেদিন খাওয়া হল চমৎকার। এমন পরিতোষ করে পেআর কখনো খায়নি। পেআর-এর ঘুমের জন্যে ট্রল্ একটি সুন্দর ছোট্ট গুহা খুঁজে বার

করলে! তার মধ্যে সুগন্ধি খড় পেতে দিলে। নিজে গুহার বাইরে একটা মস্ত পাথর মাথায় দিয়ে শুয়ে রইল। পেআর এত সুখী জীবনে হয়নি।

সেই থেকে ট্রল্ আর পেআর দুই বন্ধু এক সঙ্গে থাকে। কেমন করে মাছ ধরতে হয়, কোথায় সবচেয়ে বড় সবচেয়ে পাকা বেরী পাওয়া যায়, রাত কাটাবার নিরালা, গোপন, আরামের জায়গা কোথায় আছে এ সবই ট্রল্-এর কাছে পেআর শেখে। এমনি ক'রে সারা গ্রীষ্মকাল তাদের আনন্দে কেটে গেল।

তারপর শীতকাল এসে পড়ল। কন্‌কনে হাওয়া বইতে থাকল, আস্তে আস্তে বরফের আস্তরণ পড়তে লাগল পাহাড় পর্বতের উপর, গাছপালার উপর। সমস্ত পৃথিবীর মাটি পড়ল ঘুমিয়ে। চারিদিকে নেমে এল এক বিরাট নিস্তব্ধতা। পাখীরা গান বন্ধ করলে, এমন কি ঝরনাও কথা কইতে লাগলো ফিস্‌ফিস্ করে। তখন ট্রল পেআরকে কাঁধে নিয়ে এক মস্ত উঁচু পাহাড়ে গিয়ে উঠল। সেখানে গিয়ে পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড ভারি চাবি বার করল। সেই চাবি নিয়ে পাথরের গায়ে একটা ফাটলের মধ্যে লাগালে। তারপর সেই চাবি ঘোরাতেই বিরাট একটা দরজা খুলে গেল। দরজার পিছনে দেখা গেল একটি অন্ধকার পথ পাক খেয়ে খেয়ে নেমে গিয়েছে।

পেআর শুধোলে—কোথায় গিয়েছে এ রাস্তাটা?

—চল এগোই। বলে ট্রল্ পেআরকে হাতে তুলে সেই গুহাপথে ঢুকল। একটু পরেই অন্ধকার ভাবটা কেটে গেল, আর পেআর অবাক হয়ে দেখল তারা আলোয় ভরা প্রকাণ্ড এক বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে, ঘরে ঘরে তার ধনরত্ন ঠাসা। বাড়ির জাঁকজমক দেখে পেআর-এর মুখ হাঁ হয়ে গেল। তার গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না। ফিস্‌ফিস্ করে বললে—কে থাকেন এখানে?

ট্রল্ বললে—পর্বতের রাজা আগে এখানে থাকতেন। কিন্তু আজকাল রাজা থাকেন পাহাড়ের আর এক অংশে। এটা খালিই পড়ে থাকে। বরফ

পড়তে আরম্ভ হলেই আমি এখানে চলে আসি। যতদিন না বসন্তের ডাকে পৃথিবী জেগে ওঠে ততদিন এইখানেই কাটাই।

সব বাড়ি দেখা হয়ে গেলে ট্রল্ পেআরকে ছোট্ট একটি ঘর দেখিয়ে বললে —এইখানে তুমি থাকবে।

ট্রলের পক্ষে যদিও সে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়, কিন্তু পেআর দেখলে তার নিজের পক্ষে ঘরটি চমৎকার। ঘরের এক কোণে সারি সারি জ্বালানি কাঠ সাজানো, অন্য কোণে ঘর গরম করার জন্যে একটি উনুন। উনুনের পাশে চৌকি আর বিছানা।

ট্রলের নিজের ঘরে যেখানে প্রকাণ্ড ঢাকা উনুনে গন্‌গনে আগুন জলত, তারই পাশে বসে দুই বন্ধুর বেশীর ভাগ সময় গল্প করে কাটতো। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে যখন মাঝে মাঝে রোদ উঠত, তারা চাবি দিয়ে গুহার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসত আর দেখতো শী পায়ে দিয়ে লোকেরা বরফের উপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে দৌড় দিচ্ছে, আর তাদের পিছনে বরফের উপর লম্বা ফিতের মতো দাগ বসে যাচ্ছে।

একদিন ট্রল্ পেআরের জন্যে এক-জোড়া শী তৈরী করে দিল। পেআর তাইতে করে বরফের উপর লুটোপুটি খেয়ে ছুটল। খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে ঝড়ের বেগে পেআর শী পায়ে ছুটে যেত আর তার সঙ্গে তাল রেখে খুব ধীরে ধীরে থপ্ থপ্ করে ট্রল-বুড়োকে চলতে হত। পেআর যখন উল্টে পড়ে বরফের উপর গড়াগড়ি খেত, ট্রল্ তখন নীচু হয়ে দু-আঙুলে করে পেআরকে তুলে আবার সোজা করে বসিয়ে দিত।

পেআর আর ট্রল্-এর এই হচ্ছে শীতের সময়ের খেলা।

নির্জন পাহাড়ে বরফের উপর শুধু একজোড়া শী-এর চিহ্ন যদি দেখতে পাওয়া যায় দূর থেকে দূরান্তরে গেছে, আর বিশেষ করে যদি দেখা যায়, মাইল খানেক পরে-পরে শী-এর চিহ্নের দু-পাশে অদ্ভুত গোল-গোল ছাপ, তাহলে বুঝতে হবে ঐ পথ দিয়ে পেআর আর তার বন্ধু ট্রল্ গিয়েছে—তাদেরই পদচিহ্ন।

এই বলে ভদ্রলোক তাঁর গল্প শেষ করলেন। আমরাও ঠিক সেই সময় স্টেশানে এসে পৌছলুম। কুয়াশা কেটে তখন অল্প অল্প রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে।

আমি বললুম—কি রকম লোক আপনি? এমন একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের পথে পা বাড়িয়ে ফিরে এলেন? দুরন্ত বরফের পাহাড়ে ট্রল্-এর পদ-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া—এ কি কম কথা? আপনি ছেড়ে দিয়ে এলেন কি করে?

ট্রেনের কামরায় ঢুকতে ঢুকতে ভদ্রলোক বললেন—হায়, আমার যে রাজার প্রতি কর্তব্য আছে!

মিরেক বললে—অন্তত আমাদের একটু আভাস দিতে হয়। আমাদের তো আর রাজা নেই। না হয় ট্রেনটাই ফেল করতুম। ভাবুন দেখি শী-র চিহ্ন ধরে যেতে যেতে যদি গুহার মধ্যে সেই ধনরত্নে-ভরা প্রাসাদটা খুঁজে বার করে ফেলতুম কি কাণ্ডটা হত!

—আভাস দেওয়া বলছেন কেন, আপনাদের তো আগাগোড়া সবই বললুম।

—তা বললেন বটে। কিন্তু এমনই রসিয়ে বললেন যে সেই বলার ফাঁকে আমাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে এলেন এইখানে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। মিরেক বললে—বাস্, আর ফিরে যাবারও কোনো উপায় রইল না দেখছি।

আমি বললুম—নরওয়ের পর্বত-কন্দরে যে অপূর্ব রত্নরাশি লুকোনো রইল, বিদায় তার কাছ থেকে।

কাঁচের বড় জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলুম, বরফের উপর রোদ এসে পড়েছে। চোখে ধাঁধা লাগে। তুষারের উঁচু-নীচু ঢেউ একটার পর একটা তীর-বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এরই পিছনে সেই ফিতের মতো একজোড়া শী -এর দাগ কত পাহাড়ের অলিগলি পার হয়ে কে জানে কোথায় শেষ হয়েছে। হু-হু করে ট্রেন নীচের দিকে নেমে চললো। এবার সত্যিই বরফের দেশ থেকে

বিদায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে কোথায় গেল বরফ কোথায় কি? আমরা নেমে এলুম নীচে পর্বতের অধিত্যকায়—ভরা-গ্রীষ্মের দেশে।

পাঁজির তিথি অনুযায়ী গ্রীষ্মের বিদায়ের সময় এসে গেছে। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিতে চট্ করে কোথাও তার চিহ্ন চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হল, এই আমাদের যাত্রার শেষ পর্ব—এবার ফিরতি-মুখে। 'গল্' স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন থামলো। সহযাত্রী ভদ্র-লোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং তাঁর সরস গল্পের জন্যে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নেমে পড়লুম।

ফিরতি-পথে আমাদের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। অভিজ্ঞ লাফাযাত্রী আমরা, অভিজ্ঞ চরণিক। 'গল্' থেকে একখানি লরি থামিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌছলুম অস্‌লো।

অস্‌লোয় এসে মনে মনে বিদায় নিলুম নরওয়ের কাছে। পরদিন বিকেলের মধ্যেই সীমান্ত পার হয়ে প্রবেশ করলুম সুইডেনে।

'টাহুন্' 'গোএটেবোর্গ' সমুদ্রতীরে 'ট্রাস্‌লভ্‌স্ লাগে' জেলেদের গ্রাম, তার-পরই সুইডেনের উপকূল 'হেলসিংবোর্গ'। সাড়ে তিন দিনে সেরে দিলুম এতটা পথ। সুইডেনে যখন প্রবেশ করেছিলুম, নরওয়েতে যখন প্রবেশ করেছিলুম, প্রতিদিন প্রতি মিনিটে আমাদের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। চোখ কান খোলা ছিল, সমস্ত মন সমস্ত চেতনা দিয়ে সব কিছু গ্রহণ করেছি। এগিয়ে চলেছিলুম চাখতে চাখতে ধীরে ধীরে রস গ্রহণ করতে করতে। ফেরবার পথে কিন্তু গতিও যেমন বাড়ল, চোখ কান মন প্রাণ সব বন্ধ হয়ে গেল। হু-হু করে সব বেরিয়ে গেল হাতের দু-পাশ দিয়ে—কিছুই পেলুম না।

গ্রীষ্মের শেষ। গাছের পাতার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সেখানে সবুজ সরস প্রাণের পরশ আর নেই। রং লাগতে আরম্ভ হয়েছে। পক্কতার রং। আর কয়েকদিনের মধ্যেই সোনালী, কমলা, বাদামী, খয়েরী, হলদে, লাল আর এই সব রংএর হেরফেরে সারা বন-উপবন মাত হয়ে যাবে। হেমন্তের আগমনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এদেশে গ্রীষ্মকাল

ঠিক এমনি করেই হঠাৎ পালিয়ে যায়। হেমন্তের আমেজ যেই বাতাসে লাগে, অমনি মনে পড়ে যায়—ছুটির খেলা এইবার শেষ।

পরের দিন লাফা-যাত্রা করে আমরা কোপেনহাগেনএ পৌছলুম।

এই ডেনমার্কেই আমাদের লাফা-যাত্রা শুরু হয়েছিল। মনে পড়ল, এইখানেই চলার পথে সেই প্রথম সহৃদয়া মহিলার দেখা পেয়েছিলুম, যিনি তাঁর ছোট্ট সবুজ মোটার গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের লাফা-যাত্রার পথে ঠেলে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল, যিনি আমাদের বল কুড়োতে গিয়ে আমাদেরই কুড়িয়ে নিয়েছিলেন পথ থেকে। তারপর সেই তরুণ ডেনিশ কবি যিনি কাব্যের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছেন লাফা-যাত্রার পথে। এস্‌পেরাণ্টো বুড়ো। গ্যোটা খালের জাহাজের কাপ্তেনের মুখে রূপকথা শোনা চাঁদের আলোয় স্টীমারের ডেকে বসে। উপ্‌সালার পথে কনট্রাক্টারের গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর মনোরম কুটিরে যাওয়া ছবির মতো সিগটুনা হ্রদের তীরে—যেখানে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। কত রকমের গাড়ি, কত রকমের চালক। প্রাইভেট গাড়ি, লরি, মাল-বওয়া ঢাকা গাড়ি, ট্যাক্সি এবং কাঠ-কয়লার ধোঁয়ায় চলা মোটার—সকলেই আমাদের প্রিয়বন্ধুর মতো তাদের পাশে জায়গা দিয়েছে। মনে পড়ল সুইডেনের গভীর বিস্তৃত বনের কিনারায় বন-রক্ষিণীর আতিথ্য। বৃষ্টির মধ্যে তাঁর কুটিরের রান্নাঘরে বসে সসেজ খেতে খেতে জানলার মধ্যে দিয়ে বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে অরণ্যের দুর্বার ডাক শুনতে পেয়েছিলুম—মনে হয়েছিল অরণ্যের জীবনের মধ্যে বিলিয়ে দিই নিজেকে। মনে পড়ল নরওয়ের সেই সরল লরিওয়ালার কথা, যে আমাদের 'জিপসি' ভেবেছিল এবং জোর করে আমাদের হাতে এক ঠোঙা 'রেড কারেণ্ট' গুঁজে দিয়েছিল। লাজুক ইংরেজ ছেলে যে নরওয়েতে এসেছিল সাইকেল নিয়ে কিন্তু নরওয়েবাসীর অতিথিবৎসলতার গুণে শেষে হল লাফা-যাত্রী। উত্তর মেরুপ্রদেশের জেলেদের দুই ছেলে, তারা আমাদের নিয়ে পাড়ি দিতে চেয়েছিল পৃথিবীর সীমান্ত পর্যন্ত, যার পরে ধূ ধূ সমুদ্র আর নিমজ্জিত

বরফের চাঙড় পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপর য়োটুনহাইম পর্বত-শ্রেণীর হ্রদের গোলকধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে' হারিয়ে স্থির গভীর নরওয়ের ফিয়োর্ড, তার কোলে কোলে ঘুমন্ত জেলেদের গ্রাম—সেখানকার তারা মাছও ধরে, আবার ফাঁদ পেতে রূপোলী লোমের শেয়ালও ধরে। এই সবের শেষে নরওয়ের রাজা হাকন্‌এর সঙ্গে দেখা বরফের দেশ ফিন্‌সেতে। তাঁকে সেলাম জানিয়ে ফিরে এলুম, আবার এই কোপেন-হাগেনএ। এইখানেই যাত্রা আমাদের শেষ হল।

মিরেক প্রাহার টিকিট কাটল, আমি কাটলুম লণ্ডনের।

বিদায়ের আগে মিরেক বললে—সব স্মৃতির মধ্যে আমার আজ সেই ডেনিশ কবির কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ছে। লাফা-যাত্রার মধ্যে যে কতটা কাব্যরস, তা কজনই বা বোঝে তার মত? কে জানে, সে হয়তো এতদিনে তার লাফা-যাত্রার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র কাব্যে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আমি ভাবছি আমাদের অভিজ্ঞতার কি হবে?

আমি বল্লুম—হায়, তুমিও কবি নও, আমিও কবি নই। আমাদের এই লাফা-যাত্রার বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা দেখছি মাঠেই মারা গেল।